KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ কার্তিক, ১৩৬২ ফাল্গুন, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C 3597 -/8/- Phone: 23-5155 SAMAKALIN

আদর্শ পথ্য
পানীয় ও খাদ্য

লিলি
ব্যাণ্ড
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ
ও
স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ লিঃ কলিকাতা-৪

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ মাঘ ১৩৬২

SHETH MANGALDAS GROUP OF MILLS

Specialised in Quality Cotton Fabrics

SAREES, DHOTIES, POPLINS, SHIRTINGS, MULLS, & TAPESTRY

★

ARYODAYA SPG. & WVG. CO., LTD.
AHMEDABAD

ARYODAYA GNG. & MFG. CO., LTD.,
AHMEDABAD

VICTORIA MILLS LTD.,
BOMBAY

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ মাঘ ১৩৬২

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষের নবজাগরণের উৎস : সমরেন রায় ১
মনের ছবি : হেমলতা ঠাকুর ২০
বাংলা গল্প-সাহিত্য ও রামরাম বসু : সলিলপ্রসাদ ঘোষ ৩২
বিভূতিভূষণের আরণ্যক : রথীন্দ্রনাথ রায় ৩৫

কবিতা

সঙ্গিনী : অসীম দত্ত ১৪
আসবেই যদি : রবীন্দ্র অধিকারী ১৫
সেঁজুতি : অমলেশ মিত্র ১৬
কান্না : অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ১৭
ভিজে ঘর : তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯

গল্প

দ্বীপ : বীরেন্দ্র মিত্র ২৩

উপন্যাস

পুরন্দরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১

সমাজসমস্যা

সংবাদপত্রে জ্যোতিষ : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৫০

চিত্রকলা

অ্যাকাডেমি অব্ আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ : নারায়ণ চৌধুরী ৫২

গ্রন্থপরিচয়

মরুতীর্থ হিংলাজ (অবধূত) : হীরেন বসু ৫৫

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

ARUNA

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

Specialities

SAREES
DHOTIES
SHIRTINGS
POPLINS
LONG CLOTH
VOILS Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

ARUNA

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৬২

ভারতবর্ষের নবজাগরণের উৎস

সমরেন রায়

সিন্ধুনদের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। বরঞ্চ, বেশ দেখা যায় একই কাঠামো ক্রমশঃ শিথিল হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে এক জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে। ধারাবাহিকতাকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া তার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই বা এইভাবে টিকে থাকবার পিছনে কোন যুক্তি নেই। কিন্তু তবুও এই হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা শুধু যে টিকেই আছে তাই নয়, রীতিমত জেঁকে বসে আছে—এবং জেঁকে বসে আছে এই একটি মাত্র কারণে যে, সেই সমাজ-ব্যবস্থা যে অচল, এবং মানুষের মুক্তির পরিপন্থী, অথবা ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতার প্রতীক এই চেতনা প্রস্ফুটিত হয়নি বলে। এই চেতনা প্রথম উদ্বুদ্ধ হলো ইংরাজদের এবং ইংরাজী শিক্ষার আসার সঙ্গে সঙ্গে। তাই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার প্রথম সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হয়। ভারতবর্ষে এটা নবজাগরণ বললে ভুল হবে,—এই প্রথম ভারতবর্ষে প্রাণের ও মুক্তির উন্মেষ হয়। এক শতাব্দীর মধ্যেই সেই উন্মেষ স্তিমিত হয় পাশ্চাত্য-সভ্যতা-বিদ্বেষী জাতীয় আন্দোলনের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের নব-জাগরণের উৎস ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্যে। প্রাচীন জগতে (মিশর, মেসোপোটামিয়া প্রভৃতি সভ্যতা) আমরা দেখি মৃতের পূজার এক সাড়ম্বর আয়োজন। সেই প্রাচীন জগৎ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষের বর্তমান জীবন ও সুখ-দুঃখের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখা যায় না। সব কিছুই পরলোকের উদ্দেশ্যে—সব কিছুই মৃতের পেছনে। ব্যক্তি-মানুষ সম্পূর্ণভাবে পিতৃসত্তা সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বদ্ধ, এবং সেই সমাজাদর্শে পরিচালিত। প্রাচীন জগতের ইতিহাস মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্দশার প্রতিচ্ছবি মাত্র—আর এর অন্য দিক হলো—পুরোহিত-সম্প্রদায় কর্তৃক পরলোকের

শান্তির প্রচেষ্টা। রাজা এবং পুরোহিত সম্প্রদায় মানুষের জীবনের সমস্ত কিছু নিঃশেষ করে নিয়েছিল—একদল বর্ত্তমান জীবনের কার্য্যক্ষমতা আর একদল চিন্তাশক্তি। জ্ঞানও ছিল পুরোহিত শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি। অজ্ঞান মানুষের অন্ধকারে চলার একমাত্র আধার এমন এক মানুষ যে জোরের সঙ্গে বলতে পারবে—এইই ঠিক পথ। তাই, যতদিন জ্ঞান, বিদ্যা ছিল সাধারণের বহির্ভূত, ততদিন মানুষ এই পুরোহিত-শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

এর বিপরীত ঘটলো গ্রীক সভ্যতার উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে। নির্জীব, হতাশ মানুষের মধ্যে প্রথম জীবনের আনন্দ উথ্‌লে উঠলো গ্রীসে। গ্রীক সভ্যতার সবথেকে বড়ো কথা হলো আনন্দ—গ্রীসে প্রথম শুরু হলো খেলাধূলা। যত রকমের খেলাধুলা হতে পারে—আর খেলা ও আনন্দের এত সম্মান জগতে আর কোথাও বোধহয় কখনও হয়নি। হেরোডোটাস তাঁর ইতিহাস লিখতে লিখতে এক খেলোয়াড়ের প্রদর্শনী দেখতে কিছুক্ষণের জন্য লেখা বন্ধ করলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। এক নূতন প্রাণের সঞ্চার হলো গ্রীসে—মৃতের পূজার অবসান হলো, প্রাণের পূজা শুরু হলো; ব্যক্তি-মানুষের বিকাশের যুগ শুরু হলো। গ্রীসের এই আনন্দোচ্ছ্বাস ও মুক্তি কামনার প্রতি বিদ্বেষ করে মিশরীয় পুরোহিত বললে "সোলন, সোলন, গ্রীস নাগরিক—তোমরা শিশু"। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, নাটক, অভিনয়, খেলাধূলা, শিক্ষা—সবের এক বিরাট সমন্বয়, গ্রীক সভ্যতা। গ্রীসেই প্রথম উচ্চারিত হলো—'ব্যক্তি-মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি'—শুধু উচ্চারিত হলো না—গ্রীক সমাজ ও সভ্যতা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করলো। পরনির্ভরতা—চিন্তার ক্ষেত্র ও সমাজাদর্শ থেকে দূর হলো, মানুষ নিজে চিন্তা করে বিচার করতে শিখলো; গ্রীসে প্রথম চিন্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং স্বীকৃত হলো। 'যে মানুষ তার নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারে না—সেই দাস' বললেন ইউরিপিডিস্।

এস্‌কাইলাসের "পারসিয়াস" নাটকে গ্রীকসৈন্য পারস্যের রাণীকে বললে, "গ্রীকেরা তাদের প্রিয় জিনিষকে রক্ষা করতে লড়াই করে"। রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—"তাদের প্রভু নেই"—গ্রীকসৈন্য উত্তর দেয়, "না"!

গ্রীস থেকে রোমক সভ্যতা এক বিরাট পতন—তার শেষ পর্য্যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালী। ক্রিশ্চান ধর্ম্মযাজকের শাসন সমাজকে জীর্ণ করে তুলেছিল। গ্রীসের পতনের সঙ্গেই খেলাধুলারও মৃত্যু হয়েছিল। গ্রীসের খেলাধুলার মধ্যে ছিল আনন্দের খোরাক—সুস্থতার পরিচয়। রোমে তার পরিবর্ত্তে হলো খেলার নামে মানুষের নিষ্ঠুর, হিংস্র মনের অভিব্যক্তি। উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে তাকে বদ্ধ করা হলো গ্র্যান্দি থিয়েটারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীতে ক্রিশ্চান ধর্ম্মযাজকের একচেটিয়া আধিপত্য। প্রাচীন পুরোহিত-প্রাধান্যের নূতন সংস্করণ। যে অজ্ঞানতা, যে বন্ধনশীল সমাজ থেকে মানুষকে গ্রীকসভ্যতা মুক্ত করেছিল, তার পরিপূর্ণতার ও প্রকাশের সুযোগ দান করে—সেই পথ হলো রুদ্ধ। 'মানুষ নিজেই তার নিজের ভাগ্যবিধাতা'—ক্রিশ্চান ভগবান ও ধর্ম্মযাজকের বিরুদ্ধে ইতালীর নব-জাগরণের (Renaissance) জেহাদ ঘোষণা হলো। রেনেশাঁস গ্রীকসভ্যতার পুনরুদ্ধার করে ইউরোপের

সমাজে নূতন প্রাণ সঞ্চার করলো। ইউরোপের সমাজ যে পিছনের দিকে তাকিয়েছিল—তার লক্ষ্য ছিল গ্রীসের এই মুক্তিকামী সভ্যতা। তাই ইউরোপের সমাজে রেনেশাঁস প্রাচীন সভ্যতার আলোক থেকে বিকীরণ পেয়েছিল।

পাঁচ হাজার বছরের ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে সেই অনুপ্রেরণা কোথায়? পাঁচ হাজার বছরে ভারতবর্ষের সমাজ একই তালে পা ফেলে চলেছে। সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য হলো ধারাবাহিকতাকে টেনে নিয়ে চলা—যা' চলে আসছে তাকে আর টিকিয়ে রাখা। কোন পরিবর্ত্তন কোন নিয়মের বেতাল হলেই সমস্ত সমাজ এক স্বরে চেঁচিয়ে উঠবে—নিয়ম-লঙ্ঘন হলো—বিকৃত করো। সতীদাহ অবসান করার প্রচেষ্টার জন্য রামমোহন সমাজ থেকে বিতাড়িত হলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার জন্য বিদ্যাসাগর অপ্রিয়ভাজন হলেন—কলকাতা সহর থেকে ৫০,০০০ লোকের স্বাক্ষর নিয়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সরকারের কাছে পেশ করলেন বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে। যুক্তির প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করার জন্যে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়িত হলেন। কিন্তু কিছুই টিকলো না। বিধবা-বিবাহ বিল হলো—সমাজে চালু হলো না। ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণও ছিল হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা—জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে। পাঁচ হাজার বৎসরের এক কাঠামো সর্ব্বশক্তিমান হয়ে আজও প্রত্যেকটি মানুষের ভাগ্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করছে—হিন্দু পুরাণ। যা আছে—যা এতদিন টিকে আছে—তাকে টলানো চলবে না। হিন্দু সমাজের রেণেশাঁস তাই অতীতের অনুপ্রেরণার মধ্যে নয়—সম্পূর্ণ নূতন অনুপ্রেরণায়, যে অনুপ্রেরণা পাঁচ হাজার বৎসরের এই জরাজীর্ণ কাঠামোতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারবে—ব্যক্তি-মানুষকে জীবনের আনন্দে উন্মেষিত করতে পারবে।

পুরোহিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের জাঁক-জমকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, গ্রীক সভ্যতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল—সেই স্বাধীনতার ঢেউ গ্রীক সমাজে সভ্যতার প্লাবন এনে দেয়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জাঁক-জমকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বৌদ্ধ-দর্শন মানুষকে আত্মার মুক্তির পথ দেখায়—ত্যাগ ও নির্ব্বাণের মধ্যে। জীবনের আনন্দ সেখানে লক্ষ্য হল না—লক্ষ্য হলো ত্যাগ, পথ হলো আত্ম-কষ্ট। ব্যক্তি-মানুষের মনে কোন নূতন আশার সঞ্চার হলো না। (অশ্বঘোষ তাঁর প্রেয়সীকে বিবাহ করতে পারলেন না—সমাজ বাধ সাধলো।)

বর্ত্তমান জীবনে মানুষের মুক্তির আশার পথ যখন রুদ্ধ হলো—যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দ্দেশ মানুষের মনকে জয় করলো। সব কিছুর মূল—কর্ম্মফল; আত্মা অবিনশ্বর। জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্রে পরিণত হলো—হতাশার বন্ধন দৃঢ় হলো। অনিশ্চয়তা, ভয়—মানুষকে নির্জীব করে দিল। গতানুগতিকতার বাইরেই অনিশ্চয়তা—তাই সে পথ মানুষ ভুলে গেল। স্থিতিশীল, গতানুগতিক সমাজ জীর্ণগ্রস্ত হতে বাধ্য, হলোও তাই। এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন রামমোহন—পাশ্চাত্য সভ্যতা, ইংরাজী শিক্ষাকে সম্ভাষণ জানিয়ে।

•

মানুষ যখন সচেতন হয় যে, ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনে সে অনেক কিছু থেকে

বঞ্চিত, বা তার সম্ভবাধ্য—তখনই সে তার সেই অভাব দূর করতে প্রবৃত্ত হয়। আর যখন সে বুঝতে পারে, অনুভব করে যে সেই প্রাপ্য অভাব তার পাওয়া দরকার, এবং তার সেই অধিকার থেকে সে বঞ্চিত—তখনই সে তার সেই অধিকার লাভ করবার জন্য প্রচেষ্ট হয়। যতক্ষণ না সে অনুভব করছে যে সে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, তার স্বাধীনতা খর্ব্বিত, ততক্ষণ সে সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য, তার অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয় না। তাই যতক্ষণ না ব্যক্তি-মানুষ অনুভব করছে—যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা তার অধিকার, তার স্বাধীনতা হরণ করেছে—এবং তার বিকাশের জন্য, তার জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্য সেই স্বাধীনতার, সেই অধিকারের প্রয়োজন আছে,—শুধু তাই নয়, সেই স্বাধীনতা ও অধিকার ব্যতিরেকে তার জীবন ও আদর্শ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ততক্ষণ সে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। যখন ব্যক্তি-মানুষ, সমষ্টিগতভাবে অনুভব করে যে, সমাজ-জীবনে তাদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত, তাদের সমাজ-জীবন তাদের বিকাশের পরিপন্থী, তাদের সমাজ ব্যবস্থা তাদের আশা এবং জীবনের সার্থকতায় বাধ সাধছে—একমাত্র তখনই তারা সমষ্টিগতভাবে তাকে দূর করার জন্যে সচেষ্ট হয়। নতুবা, সেই অসম্পূর্ণতা সমাজে থেকেই যায়—প্রতিবাদের অভাবে—বা মেনে নেওয়ার জন্যে। গতানুগতিকার মূল সূত্রই হলো এই মেনে নেওয়া। তাই যেখানে মানুষ অনুভব করলো যে তার ন্যায্য অধিকার থেকে সে বঞ্চিত, তার স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়েছে—সেই সমাজে গতানুগতিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বস্তুত, গতানুগতিকতাকে বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের সমাজের গোঁড়ামী বা অনগ্রসরতা ঠিক এই কারণেই বৈশিষ্ট্য হিসাবে টিকে আছে। হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ব্যক্তি-মানুষ পিতৃসত্তা সমাজ-ব্যবস্থার অধীন,—তার সমস্ত জীবন ও সত্তা এই সমাজের অনুশাসনে ধার্য্য। ব্যক্তি-মানুষ হিন্দু সমাজে পূর্ব্বপুরুষের পূজার অর্ঘ্য। বৈদিক যুগ এবং সিন্ধুনদের সভ্যতার যুগ থেকেই পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, এবং তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা না করাই হলো হিন্দু সমাজের আদর্শ। বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন এই সমাজ-ব্যবস্থায় যৌথ-পরিবারের কর্ত্তা, এবং তিনি যখন কর্ত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ন—তখন তাঁর জীবন থেকে নবীনতা চলে গেছে—তাই তিনি ও সাধারণতই গতানুগতিকার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। যুব-সমাজের কোন প্রভাব হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয়নি—তাই হিন্দু সমাজে পরিবর্ত্তনের কোন ছাপ পড়েনি।

ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযানের পর প্রথম স্বাধীনতা ও মুক্তির একটু আভাষ জনসাধারণ পায়—কিন্তু ধর্ম্মীয় গোঁড়ামীর প্রভাবে সেই প্রভাব (influence) একমাত্র ধর্ম্মের অনুশাসনে জর্জ্জরিত সমাজের নিম্নতর মানুষের উপরই বিস্তারিত হয় এবং শুধু তারাই মুসলমান সমাজের দিকে পা বাড়ায়। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কোন নূতন পথ মুসলমান সম্রাটগণ দেখান নি, তাই সমাজের কাঠামোতে একমাত্র ধর্ম্মানুশাসনের অসাম্য থেকে মুক্তির মধ্যেই ছিল মুসলমান সমাজের প্রভাব। তাই মুসলমান ধর্ম্ম সমগ্র হিন্দু সমাজে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করতে সক্ষম

হয়নি—বরঞ্চ, হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী তার জন্য আরও বর্দ্ধিত হয়েছে—যেমন হয়েছিল দেব-দেবীর পূজা ও সামাজিক অসাম্য উঠিয়ে দেওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম প্রস্ফুটিত হয় ইংরাজদের আসার সঙ্গে সঙ্গে। ইংরাজদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার তিনটি প্রধান অবদান ভারতবর্ষে পৌঁছায়—ছাপাখানা, রেলপথ ও ডাক-ব্যবস্থা। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ভারতবর্ষের মানুষ তার দেশকে দেখবার সুযোগ পেল, দূর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হলো—জ্ঞান পুরোহিত শ্রেণীর আওতা থেকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। ইংরাজদের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতাও এদেশে এসে পৌঁছল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রেণেশাঁস আন্দোলন ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস,—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে যন্ত্র সভ্যতার সুরু হল তাই নয়—সমস্ত বিষয়েই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হল। যন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও জীবনের মান বৃদ্ধি করলো। অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হলো। যন্ত্রের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই ইংরাজ বণিক ভারতবর্ষে এলো—কারখানার কাঁচা মাল যোগাড় করবার জন্যে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এল পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই রামমোহন ইংরাজদের পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক হিসাবে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল সূত্র হলো ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা—ঐশ্বরিক বা পার্থিব কোন হুকুমদারের তাঁবেদার ব্যক্তি-মানুষ নয়, সে স্বাধীন, মুক্ত—তার একমাত্র পথ-নির্দ্দেশক হলো তার বিচার-বুদ্ধি।

সঙ্গিনী

অসীম দত্ত

তুমি যেন একখানি সাবলীল গতিপ্রাণ গান,
সময়ের তানপুরা তারে তারে আঙুল ছোঁয়াও,
বাতাস কাঁপাও, হৃদয় কাঁপাও, জীবন মাতাও।

ঘুম ভাঙ্গা কোন্ ভোরে ধরেছিলে ভৈঁরোর তান,
অবাক অবাক হয়ে চেয়েছিল সেদিন মানুষ,
এত আশা এত প্রাণ এত গান—হৃদয় ফানুষ।

মধুহীন মধুপের ব্যথাম্লান আজ এ গোধূলি,
তানপুরা তানে শুধু পরাগের বেদনা গমক,
সময়ের বুক চেরে, মানুষের বুক চেরে নীল কণ্টক।

আশাবরী রাগিণীতে গাও তবু সঞ্চারী কলি।

আসবেই যদি

রবীন্দ্র অধিকারী

আসবেই যদি এসো তবে কাল,
ঘাসের শিশিরে স্নিগ্ধ সকাল
ছুঁয়ে বনভূমি ; দূর পাহাড়ের
মেঘ কেটে গেছে কালো আষাঢ়ের
শ্রাবণের ধারা তাও হলো শেষ
আকাশের চাপা কান্নায়
কনক-চাঁপার মতো রোদ্দুর
মন চলে গেছে কোথা কদ্দূর
পাখা মেলে দিয়ে নীলের মায়ায়
তুমি চলে এসো গাছের ছায়ায়
ঝিরি ঝিরি বায়ে উড়িয়ে আঁচল
মাড়িয়ে ঘাসের পান্নায়
জাফরাণী রোদে মাছ-রাঙা পাখী
আজোতো আমার কত গান বাকী
কত গান বাকি বনে আর মনে
তোমার চোখের নীল-নির্জনে
আহা মরে নাই নবজন্মের
সোনালী হলুদ ঝরণায়
নদীর চরেতে সাদা কাশ ফুল
রেশমী কাজল-কালো এলো চুল
শিউলি বাতাসে উড়ুক উড়ুক
সব ব্যথা ভুলে আপনি ভরুক
শাঁখা-মাজা-মুখ সুখে বুকে থুয়ে
হৃদয়ের ঘর কল্পনায়॥

সেঁজুতি

অমলেশ মিত্র

বিচিত্র জীবনে দেখা হল
বিচিত্র তারাদের কত আলো
ধ্রুবতারা, শুকতারা, স্বাতি শাশ্বতি —
দিয়ে গেল জ্যোতি ;
বল না সেঁজুতি—
তুমি কি ওদের মত টেনে দেবে ইতি ?
শুধু আলো দিয়ে না দিয়ে তোমাকে ?
তোমার যা কিছু আছে দেবে তো আমাকে ?

জান গো সেঁজুতি—
ঝিকিমিকি তারারা যে চলে
আলোর মিছিলে,
রাত ভোর হলে—
যায় রোজ ভুলে। যাবে কি হারিয়ে ?
তোমার আশার আলো আকাশেই
দেবে কি ফুরিয়ে ?

ভুল ঝরা শেষ হলে ফুলঝরি মত,
দিতে আলো আরও হবে কি বিরত ?
আর আর তারাদের থেকে
তুমি যেন ভিন্ন মনে হয়
বল না সেঁজুতি,
তুমি কি ফিরিয়ে দেবে
ভেঙ্গে এ হৃদয় ?

তুমি কি আমায় ঘিরে
ছন্দ সুরে
গান গেয়ে ফুরোতে পার না ?
আমি যাব তোমাতেই ঝরে
তার বেশি আর তো পারি না।

কান্না

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ডাগর ডাগর দু'টি চোখ থেকে—
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে জল,
টোল্‌খাওয়া গালে--
বিন্দু বিন্দু যেন বিসর্গ লেখা,
সত্যিকারের মুক্তর মত
সত্যিকারের কান্না।
অভিনয় নয়—
পরিচালকের ইঙ্গিতে হাঁসা-কাঁদা,
অন্তর যেথা অন্তরে থাকে—
নিকটে দেয় না ধরা,
প্রতারণা করে ওষ্ঠের বাঁকা রেখা।
খরিদ্দারের হাতে-হাতে ঘোরা—
এ নয় অচল টাকা,
অলংকারের এ নয় নকল পান্না।
সত্যিকারের মুক্তর মত
সত্যিকারের কান্না।

ভিজে ঘর

তারক বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাকে সঙ্গিনী ক'রে আজো আছি এই
এই পৃথিবীর সেই পুরনো ভাড়াটে ঘরে ;
বিগত বর্ষাজলে ভিজে চৌকাঠ, এখনো সেখানে সেই
তোমার আমার ঠিক পা গিয়ে পড়ে ;
জলকাচা ধুতি-মেলা সজল দেয়াল আরো
এখনো শুকোয়নিকো মস্ প'ড়ে গেছে ;
কোণ-ঘেঁষা হাতড়ানো কুলুঙ্গি আঁধার
এক কোণে ভীরু হয়ে আজো পড়ে আছে ;
মৃতের চোখের মত মনের হরষে নয়
প্রসন্ন দিবসে-জ্বলা বিজলীর বাতি
করুণ আলোক নিয়ে জ্বলে এই ঘরে—
অপুত্রক তুমি আমি আজো পড়ে আছি।
শতাব্দীর কিছু যেন শতক সময় দেয়াল-পাঁজিতে ছিল,
আজই না হয় অন্ধকারে স্থির হয়ে ভিজে হয়ে আছে ;
পৃথিবী শুকোয়নিকো এক যুগ এক বুক কেঁদে কেটে নিল ;
স্যাঁৎসেতে ফুসফুস এখনো রয়েছে
হৃদয়ের আবছায়া ঘরে নোনাধরা দেয়ালে দেয়ালে
সময়ের শব্দ ক'রে জীর্ণ আস্তর যত খ'সে খ'সে পড়ে
শাদা গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো প্রশান্ত খেয়ালে
ঘরময় উড়ে উড়ে শুধু খেলা করে।
শিষ্ট এই শতকের আরো কত কাল বিশিষ্ট বইব' বলো
তুমি আমি, ভিজে চোখ, সপসপে বিছানার ডানা,
ছাতা-পড়া কলসীর অন্ধকার জল—জলার্ক আলো
এসব শুকোবে কবে বলো তাই একবার বলো।

মনের ছবি

হেমলতা ঠাকুর

স্বামী, শ্বশুর হারিয়ে সংসার বন্ধন যেদিন নির্মূলভাবে ছিন্ন হয়ে গেল, দুনিয়ার দিকভোলা পথে এসে সেদিন উদাস দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়ালুম। মাথার উপর খোলা আকাশ, পায়ের তলায় শ্মশান জাগানো ধূ ধূ মাঠ ছাড়া মনের সামনে যখন আর কিছুই রইল না, মন যখন কোথায় যাবে, কি করবে কোন দিশা পাচ্ছে না, কি জানি কেমন করে কোন পথ ধরে মনের কাছে একটি ডাক এসে পৌছল।

ভুবনডাঙ্গার মানুষগুলি এসে বললো, আমাদের জল নাই, জলের বড় কষ্ট। সমস্ত ডাঙ্গাটার মধ্যে কুয়ো নাই, ইঁদারা নাই, একমাত্র বাঁধের জল ভরসা। এতগুলি লোকের স্নান, পান, গরুবাছুর খাওয়ান নাওয়ান, ডাঙ্গাটাকে অস্বাস্থ্যকর কোরে তুলেছে দিনে দিনে। ভুবনডাঙ্গা আমাদের বহুদিনের পরিচিত গ্রাম, গ্রামের লোকগুলি আমাদের একান্ত আপনার। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে বাঁধের জলটুকু দেখে মহর্ষিদেব তার পাশে তাঁবু ফেলে যেদিন প্রথম বসলেন, ভুবনডাঙ্গার মানুষদের সঙ্গে সেইদিন থেকে তাঁর সম্বন্ধ গড়ে উঠতে সুরু হোল। সেই সম্বন্ধ স্থায়ী হয়ে গেল মহর্ষি পরিবারের সঙ্গে যেন চিরদিনের মত ভুবনডাঙ্গার লোকেদের।

দ্বারিক, সর্দ্দার, সুচাঁদ, হরিশ মালী, বঙ্কু মালী, হরি, মহর্ষিদেবের সময়কার লোক। এরা সবাই জাতিতে ডোম, কেবল বঙ্কু মালি হাড়ি, এরা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও প্রভু পরায়ণ। মহর্ষির সংসর্গই এদের কাছে প্রথম উচ্চশ্রেণীর মানুষের সঙ্গলাভ। শান্তিনিকেতনের পুরাতন আশ্রমবাসী লোকেরা সবাই এদের চেনেন। আমি তো শান্তিনিকেতন দর্শন ও ভুবনডাঙ্গাবাসীদের দর্শন একই সঙ্গে পেয়েছি, তাই আমার মনের কাছে এই সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

দ্বারিক সর্দ্দারের ছেলে সুচাঁদের দুই মেয়ে নীরি ও কুমি (ডাকনাম) নীচু বাংলায় আমাদের নতুন বাড়ী তৈরী হলে দুপুরে আমার কাছে এসে পড়া শিখতো। আমার বয়স তখন আঠার উনিশ হবে। তাদের এক দুই গুনতে ও অ আ পড়াতে শিখিয়ে আমার কি আনন্দ। ক্রমে দল ভারী হল, রাসুর বৌ সুবাসিনী প্রভৃতি আরও কয়েকটি বৌ মেয়ে এসে জুটলো পড়ার সময়, যেন পাঠশালা বসে গেল আমাদের বাড়ীতে দুপুরে। এমনতর পড়া পড়া খেলা মনের মধ্যে কি উল্লাস জাগিয়ে তোলে যে কখনও এমন খেলা খেলেছে, এমন খেলাঘর গড়ে তুলেছে সেই তা জনে।

প্রথম শ্বশুর ঘরের আনন্দ স্মৃতির সঙ্গে এই সব ছোট ছোট মেয়েগুলির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে আজও মনের মধ্যে। তারপরে স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী মনোরমা দেবী ও তাঁর বিধবা

ভাগিনেয়ী প্রভাময়ী আমার কাছে ছোট্ট ইংরাজী বই নিয়ে পড়তে আসতেন। এই পড়ার সূত্রটুকু ধরে শেষে প্রভাময়ী টেনিং পাশ করে কলিকাতা কর্পরেশনের ছোট ছোট স্কুলগুলিতে উচ্চবেতনে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন গৌরবের সঙ্গে। ঘর সংসারের কাজ ছাড়া এই ছিল আমার একটা সখের কাজ, যেখানে কোন দাবী নাই অথচ কাজ আছে। আর আমার শিশুতুল্য ভোলানাথ শ্বশুর মহাশয়কে সন্তানাধিক যত্নে লালন পালন করা ছিল আমার আর একটি পুণ্য কাজ। তাঁর সেবায় আমার কাছে স্বর্গ মর্ত্ত মোক্ষ সব যেন এক হয়ে যেত। এমন বৃদ্ধ শিশু মানুষ কোথাও কখনও দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য উজ্জ্বল জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল তাঁর মন ও বুদ্ধিতে।

এই সব কাজের জিনিষ, কোলের জিনিষ, হাতের জিনিষ হারিয়ে যখন আমি একেবারে ফাঁক্য তখন এই ভুবনডাঙ্গার লোকেরাই আমার মনের মধ্যে প্রথম সাড়া জাগাল ডাক দিল জল নেই বলে। পরদিন বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ভুবনডাঙ্গার মাঝখানে একটি ইঁদারা খোঁড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন শ্রীনিকেতনের কর্ম্মী কালীমোহন ঘোষ। ইঁদারা খোঁড়ার চুক্তি হোল গ্রামবাসী নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ মুসলমান আতাবক্সিনের ভাগিনেয় এবাদতের সঙ্গে চারশো টাকায়। ইঁদারা খোঁড়া দেখার একটা আকর্ষণ আছে মানুষের মনে। মাটির গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত সে যেন মানুষের মনকে টেনে নিয়ে যায়। মাটির কোলে যে একটি মাতৃস্নেহের সুন্দর স্নিগ্ধ ভাব আছে মানুষকে সেটা অনুভব করায় নিবিড়ভাবে। আমার মনে একটা কৌতুক জাগলো, রোজ ইঁদারা খোড়া দেখতে যাওয়ার। আমার শূন্য মনে একটি সহজ শান্তির ভাব এনে দিতে লাগলো। যখনই যেতুম পাড়ার ছোট বড় মেয়েরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াত। তারাও মন দিয়ে ইঁদারা খোঁড়া দেখতো। আমার উদাস মনে মেয়েগুলির সংসর্গ একটা সুখ জাগাতে লাগলো। ভালবাসার এ এক অপূর্ব্ব রাগ। ক্রমে সেইখানে বসে ভুবনডাঙ্গার বুড়োরা মহর্ষিদেবের গল্প, বাবামহাশয়ের (শ্বশুর মহাশয়) গল্প, আমার স্বামীর গল্প জুড়ে দিত খুসীর সঙ্গে। আমার স্বামী ভুবনডাঙ্গার লোকদের খুব ভালবাসতেন। ভুবনডাঙ্গার ডোমের ছেলে অমূল্য, বয়স কুড়ি বৎসর, আমার স্বামীর কাছে বেয়ারার কাজ করতো। তার বাপ অসুস্থ, দীর্ঘদিন ভুগছে, মুড়ি ও ভাত ছাড়া তাদের ঘরে অন্য কোন খাদ্য নাই। আমার স্বামী প্রতিদিন রাত্রে খেতে বসে নিজের খাবার কিছু কিছু তুলে অমূল্যর হাতে দিতেন। তার বাপের জন্য সে বাড়ী নিয়ে যেত। ভুবনডাঙ্গার ইঁদারা খোঁড়া দেখতে দেখতে আমার মনে পড়তে লাগলো সেই সব স্মৃতি। মনে হতে লাগলো আমার স্বামীকে যেন তাদের মধ্যে পাচ্ছি। আমার শ্বশুর পরিবারে সকলেই খুব ভৃত্য-বৎসল। মহর্ষিদেব তাঁর পুত্রেরা ও পৌত্রেরা সকলেই ভৃত্যদের প্রতি একান্ত স্নেহশীল।

একদিন এক ব্যক্তি মহর্ষির ভৃত্য-প্রীতি লক্ষ্য করে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন, মহর্ষির এতগুলি পুত্র, তাতেও তাঁর সাধ মেটেনি, আরও পালিত পুত্রের প্রয়োজন। আমার ভোলানাথ শ্বশুর মহাশয় টেবিলে খেতে বসে ভৃত্যের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে নিজের খাবার থেকে তুলে

তাদের হাতে দিতেন। তারা সামনে দাঁড়িয়ে থাবে তাতে তিনি বড় আনন্দ পেতেন। কাকামশাই (রবীন্দ্রনাথ) ভৃত্য উমাচরণকে কি ভালবাসতেন বলার নয়। তিনি দার্জিলিং যাবেন, ট্রেনে চড়েছেন, বনমালীর কি কান্না প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, কাকামহাশয় বললেন, কেঁদনা, আমার জিনিবগুলি নেড়েচেড়ে ঝেড়ে ঝুড়ে রেখ, আমিতো আবার আসবো। সে স্নেহের সম্বন্ধ, চাকর মনিব সম্বন্ধ নয়।

দ্বীপ

বীরেন্দ্র মিত্র

এইটাই পনেরো নম্বর বাড়ি। কাঞ্চন আর মালার বাড়ি। এই দুই কুঠুরীর ফ্ল্যাটটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর নির্মলবিকাশবাবু, সরকারি অফিসের লোয়ার গ্রেড কেরানী, সাধ্যাতিরিক্ত সেলামী দিয়ে আবিষ্কার ক'রেছিলেন। পাড়ায় জনশ্রুতি অবশ্য ভিন্ন রকম। সে-সমস্ত দুষ্টু এস্‌প্ল্যানেডের ধুলোর মতো অক্লেশে গা' থেকে ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা আছে বলেই এখনো টিকে আছেন নির্মলবিকাশ, আর তাঁর মেয়ে কাঞ্চন ও মালা, আর তাদের মা তরুশোভা।

বুদ্ধিমান সাংসারিক ভদ্রলোক সমস্ত বক্তব্যের শেষে স্বীকার করেছেন, 'সংসারনীতিতে অভিজ্ঞ বটে নির্মলবিকাশ!' কেউ বলেছেন, 'আর যা দিনকাল ম'শায়!'

মেয়েদের আলোচনায় অবশ্য এভাবে ভাতের মাথা টিপেই ফ্যান গালার ব্যবস্থা হয়নি। সমস্ত ভাত নিঃশেষে গলিয়ে নির্ভেজাল ফ্যানের আয়োজন করেছেন তাঁরা। অতএব কাঞ্চন-কুমারী ও মালরাণীর মা'য়ের প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছে প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যে। প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, দিনকাল যেমনই হোক্, বিকিয়ে দিতে হবে নাকি তাই হলে? জলের মতো বয়ে যাচ্ছে মেয়ে দু'টো। স্নানার্থীর অভাব নেই। ডুব দিয়ে যাচ্ছে অনেকে। পাড়ার বয়স্থা মেয়েদের বিশেষ সাবধান করা দরকার।

প্রস্তাব অনুযায়ী কাজের ব্যতিক্রম হয়নি। পনেরো নম্বরের এ ফ্ল্যাটটা পৃথক হয়ে গেছে আর দশটা বাড়ি থেকে। পাড়ার অন্যান্য বাড়ির জানলাগুলো হাঁ করে থাকে পনের নম্বরের দিকে; কিন্তু কখনই কোন গবাক্ষ পথে আহ্বান আসেনা কাঞ্চন বা মালার।

তরুশোভা নতুন বাড়ি উঠে এসেই পাড়া সফরে বেরিয়েছিলেন। নিজের চেষ্টায় আলাপও করলেন দু'সারি বাড়িতে। কিন্তু শীঘ্রই বিদায় নিতে হল তাঁকে। যেদিন উকিলবাবুর গ্র্যাজুয়েট ছেলে দেবাশীষের সঙ্গে পনেরো নম্বরের দরজায় দাঁড়ায় সন্ধ্যার আবছায়ায় হেসে হেসে কথা বলতে দেখা গেল মালারাণীকে; আর তার কিছুদিন পরই প্রফেসর বোসের ছোটভাইকে কাঞ্চনকুমারীর পাশে পাশে হেঁটে বেড়াতে দেখা গেল লেক ময়দানের আশেপাশে; তার পরই তরুশোভা মেয়ে দুটিকে কাছে ডেকে বললে, "থাক্‌গে, কলকাতা শহরে কে-বা কা'র খবর রাখে বল্। দরকার কি, আমরা নিজেরাই বেশ থাকতে পারব, এমন যে পাড়া সে পাড়ায় নাই-বা রইল সম্বন্ধ।"

শেষে কর্তব্য স্থির করতে হল মালা আর কাঞ্চনকে। তারা মুখে আগের থেকে বেশি হাসি ফুটিয়ে সাজের বাহার অপেক্ষাকৃত বাড়িয়ে, বেড়াবার সময় আরও একটু দীর্ঘ করল।

পাড়ায় পনেরো নম্বর বাড়িতে মাকা পড়ল, জানলাগুলো হাঁ ক'রে সে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সকাল সন্ধ্যা।

কিন্তু প্রকাশ্যে শত্রুতা ঘোষণা করে বসলেন সুনয়নী, ইন্‌সুরান্সের দালাল দেবদেবের স্ত্রী। তাঁর জানলা পনেরো নম্বরের ঠিক উল্টো দিকে। দোতালায় ঘর। নজর রাখার সুবিধে। একটু সতর্ক হলেই তরুশোভার সংসারের নাড়ি টিপে সুস্থতা অসুস্থতার খবর বার করতে পারেন। কাজও হল তাই। সত্যে মিথ্যে রাশিকৃত গল্প মটরশুটির মতো গড়িয়ে দিতে লাগলেন মেয়েদের মধ্যাহ্ন আসরে। লোকেও বিশ্বাস করল, অবিশ্বাসের হেতু খুঁজে পেল না বলেই, না বিশ্বাস করতে ভাল লাগল বলেই, সে কথা হলপ ক'রে বলা শক্ত।

চোখ কপালে তুলে উকিলগিন্নি বললেন, "মাগো! এতও দেখতে হবে এই জীবনে। কিন্তু কি করি বল, ছেলেরা বড় হয়েছে, হাতের বাইরে এখন। তবে উনি একদিন কড়া ক'রে ধমকে দিয়েছেন।"

প্রফেসর-স্ত্রী হাতের বোনায় চোখ রেখে বললেন, "তবু দিদি কপাল ভাল আপনার। ছেলে কথা শোনে। আর তো ওবাড়ির দিক মাড়াতে দেখিনা।"

সুনয়নী সায় দিলেন, "তা যা বলেছেন ভাই, দেবু তো দেবু, হীরের টুকরো যেন।"

কথাটায় অনেকেই মুখ টিপে হাসলেন। জানতে কা'র বাকি নেই, মেয়ে জবার জন্য পাত্র খুঁজছেন সুনয়নী। শোনা যায়, উকিলগিন্নি জবার মতো শান্ত ধীর মেয়েই পছন্দ করেন।

সুনয়নীর কথার উত্তরে উকিলগিন্নি বললেন, "কি ক'রে বলি বল, এতবড় কলকাতা শহরে কে কোথায় গোপনে কি করছে, বিধাতা স্বয়ং তা বলতে পারেন না। দেবুর সম্বন্ধে তাইতো নিশ্চিন্ত হতে পারিনা।"

সুনয়নী কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে প্রতিবাদ করলেন, "না, না, দেবু আপনার অত বোকা ছেলে নয়। আর ঐ কাঞ্চন ছুঁড়িও ঘাঘু। তেমন কিছু হলে ও' কি আর একটা নতুন ছেলে নিয়ে পাড়ায় ঢোকে?"

কথাটা ভেবে দেখবার মতো বটে। কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে একটি নেকটাই আঁটা ছেলে কিছুদিন হল আসা-যাওয়া করছে। অনেকেরই নজর পড়েছে। বয়স্থা মেয়ে থেকে মেয়েদের মা পর্যন্ত কারই দৃষ্টি এড়ায়নি।

আরতির মা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "ছেলেটা করে কি বলত, জামা কাপড়ের বাহার তো খুব!"

একটু নড়ে বসলেন সুনয়নী, "করবে আবার কি, আজকালকার ছেলেরা যেমন—"

কেমন, সে কথা আর ভাঙলেন না। যদিও তিনি খবর নিয়েছেন, ছেলেটি নতুন পাশ-করা ডাক্তার। বাপের বিরাট সম্পত্তি।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। নাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর-স্ত্রী, বললেন, "আজকালকার

ছেলে কেন দিদি। ঠাকুরপো বলছিল, ছেলেটি ডাক্তারি পাশ করেছে—এরই মধ্যে বেশ প্র্যাক্‌টিশ। বাপের সম্পত্তিও যথেষ্ট।"

অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন কথায়। শুধু দুটি অর্ধোচ্চারিত শব্দ শোনা গেল, "তাই না-কি!"

কেবলমাত্র সুনয়নী কপাল কুঁচকে বললেন, "তা হবেও বা। হেন যায়গা নেই যেখানে ধিঙ্গি মেয়ে দু'টো না যায়। অত খবর কে রাখে।" তারপর চাপা বিরক্তিটা প্রকাশ ক'রে ফেললেন, "তা আপনার কাছে তো খবর যাবেই। দেওরের যাতায়াত আছে তো ও বাড়িতে।"

প্রফেসর-স্ত্রী এ আঘাত গায়ে না মেখে বললেন, "দেওরের খবর দেওরই জানে। আমাদের অত মাথা ঘামাবার দরকার কি।"

ওঠবার সময় সকলে তবু একবার ক'রে বুঝিয়ে গেলেন প্রফেসর-স্ত্রীকে। দেওরটি ছেলে হিসেবে যখন খারাপ নয় তখন তাকে এভাবে বয়ে যেতে না দেওয়াই উচিত। কেন, চনিয়ায় কি মেয়ে নেই আর?

আছে বৈকি। জবা আছে, আরতি আছে, সন্ধ্যা দীপালী অনেকেই আছে। সর্বকর্মনিপুণা সহধর্মিণীরা তারা।

বিদায় নেওয়ার সময় সুনয়নী উকিলগিন্নিকে বললেন, "জবার জন্যেই যা ভাবনা। যা দিনকাল দিদি।"

উকিলগিন্নি তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন, "না, না, জবা তোমার ভাল মেয়ে।"

খুশি হয়ে বিদায় নিলেন সুনয়নী।

সন্ধ্যার দিকে দেবদেববাবু ফিরলে কাছে বসে আজকের দ্বিপ্রাহরিক আসরের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন সুনয়নী, হঠাৎ জানলার বাইরে দৃষ্টি পড়তেই চুপ করলেন। জানলার কাছে চেয়ারটা আর একটু টেনে নিয়ে বললেন, "এর একটা বিহিত কর বাপু তোমরা। পাড়ার পুরুষগুলোর কি এতটুকু মনেও হয় না?"

দেবদেব তাকালেন। যদিও পরের বাড়ীর ভেতর উঠোনে দৃষ্টি ফেলা উচিত নয়, তবু পনেরো নম্বর বাড়িটা দ্রষ্টব্য, ওখানে দৃষ্টি দিলে ভদ্রলোকের সন্ধান হানির কারণ নেই। দেখলেন, মালা একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। এক সময় ঐ দু'টি ছেলেমেয়ের চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিজের লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করলেন, তাতে দেবদেবের স্বর কিছুটা রুক্ষ শোনাল, "তা ওরা যা করে করুক না, তোমাদের মত সব সময় গোয়েন্দাগিরির মানে তো কিছু বুঝি না!"

"বুঝবে এমন মুরোদ কৈ? তোমাদের মতো ভীতু পুরুষেই এমন ক'রে মুখ বুজে সব সইতে পারে। রোজ এত নতুন ছোঁড়া জোটায় কোত্থেকে? ছেলেটাকে আগে তো দেখিনি।" বলে তিনি আর একবার ভাল ক'রে দেখলেন। তারপরই কি মনে হতে হঠাৎ মাথাটা একেবারে

ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "রূপের ছিরি তো মা পঞ্চাশবার পাফ্ ঘষলেই বদলায় না। একটু আধুনিক ষ্টাইলের স্মার্ট হলে বরং আরও রূপ খোলে—তা যা ল্যাদাড়ে তুই। নে, নে, তাড়াতাড়ি কর জবা। ওরা সব ক'টি মেয়ে এখুনি হয়ত এসে পড়বে।"

যার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হল, সে মেয়েটি চকিতে আয়নার কাছ থেকে ছিটকে ক্রমে বোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর সেদিকে তাকিয়ে মৃদু আপত্তি করলেন দেবদেববাবু।

ঝগড়াটা দানা বাঁধতে পারত, কিন্তু দরজার গোড়াঃ পাড়ার মেয়েগুলি এসে দাঁড়াল।

"জবার হয়েছে মাসিমা?"

সুনয়নী চোখ তুললেন। বাঃ বেশ দেখাচ্ছে আরতিকে। সন্ধ্যারও রক্তজবা শাড়িটা দেহের সঙ্গে লেপ্টে থেকে অঙ্গসৌষ্ঠব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ওদের সঙ্গে তুলনা হয়না জবার। দীপালী মেয়েটাই যা রঙে নীরেস, মুখশ্রীতে জবার চেয়ে খারাপ। তা হোক্, বাপের পয়সা আছে; ওটুকু দোষ ঢেকে যাবে। এই তো সবাইকে ডিঙিয়ে ওর-ই সম্বন্ধ এল। কিন্তু জবার? দেশে রোজগেরে পাত্র হুহু ক'রে কমে যাচ্ছে। দূর, মিছে ভাবনা। যে যার ভাগ্যে খায় পরে। তবু সুনয়নী জানেন, চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না।

দীপালীর সম্বন্ধ এসেছে। কথা প্রায় পাকাপাকি। এখন ফুল ফুটলে হয়। ও-তরফ আজ সদলবলে মেয়ে দেখতে আসছেন। তারই জন্য নিমন্ত্রণ পাড়ার মেয়েদের।

মেয়েরা বেরিয়ে গেলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ান সুনয়নী।

জবা আরও একটু স্মার্ট হলে পারত। এই এক ঝামেলা। কেউ স্মার্ট চায়, আবার উকিলগিন্নির মতো শাশুড়িরা পছন্দ করেন ধীরা, লাজুকলতা। সুনয়নী ভাবতে ভাবতে জানালার গরাদ ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

দৃষ্টি পড়ল তাঁর পনেরো নম্বর বাড়িতে। কাঞ্চন আর মালা সেই ডাক্তারের সঙ্গে বেড়াতে বেরুচ্ছে। দু'জনেই সেজেছে। ওদের সাজ একটু বিচিত্র। তা হোক্, বেশ সাজতে পারে ওরা। শরীরের সমস্ত কাঠামোটাকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে অতি অল্প খরচে। যতক্ষণ দেখা গেল, সুনয়নী দেখলেন চেয়ে চেয়ে। যত দোষই থাক্, গুণও আছে মেয়ে দু'টির। মনে মনে প্রশংসা করেন সুনয়নী। তবু একবার জোর ক'রে মাথা নাড়েন, ছি ছি, জবার যে সমাজ আছে, ওদের সে প্রতিষ্ঠা নেই। উকিলগিন্নিদের ঘরে জবার মতো মেয়েই মানায়।

দীপালীর বর নাকি ভালই হবে। ফেরবার পথে খানিকটা গুম হয়েছিল মেয়েরা। সকলেই চিন্তিত। কিসের চিন্তা, বন্ধুবিচ্ছেদের?

"তা'লে দীপালীটাই আগে ল্যাজ কাটল!" স্তব্ধতা ভাঙল জবা।

"জুড়লও একটা। দীপালী রায় এবার হচ্ছেন মিসেস দীপালী বসু।" জবাব দিল সন্ধ্যা চিবিয়ে চিবিয়ে।

আরতি যেন আপন মনেই বললে, "ভাল বর, দীপুর কাছে সব বরই ভাল, কি বল্?"

সহসা কেউ জবাব দিতে পারল না। জবার মনে পড়ল সুনয়নীর ব্যস্ততা। কী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সুনয়নী মেয়ের একটা পাত্রের জন্য। আগে-দেখা স্বপ্নগুলো তাই জবার ক্রমেই হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে। মা কি সত্যই তাকে নিয়ে বিড়ম্বিত? তাহলে তার পক্ষেই বা কোন্ ছেলেটা খারাপ, পাত্র হলেই হল।

এক সময় সন্ধ্যা আবার পূর্ব প্রসঙ্গের জের টানল, "বরের পক্ষেই বা দীপু কী এমন খারাপ? ওর বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সটা কিছু কম নয় তো?"

আরতি কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে জবা বলল, "ঐ দেখ!"

ডাক্তার, কাঞ্চনকুমারী আর মালারাণী পাশাপাশি হেঁটে বাড়ি ফিরছে। মালার হাতে রজনীগন্ধার ঝাড়। কাঞ্চনকুমারীর খোঁপা জড়িয়ে বেলকুঁড়ির মালা। দেখল সবাই। এ তরফ, ও তরফ চোখাচোখী হল। সন্ধ্যা আরতি আর জবা গতি শ্লথ ক'রে এগিয়ে যেতে দিল ওদের। আর ওরা দু'জন দু'দিক থেকে ডাক্তারের গা'য়ে আরও বেশি ঘেঁষ দিয়ে, পথের হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে, দু'একটা হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলে গেল। কেমন যেন অস্বাভাবিক, অথচ এই অস্বাভাবিকতার মধ্যেই যেন কাঞ্চন আর মালাকে সুন্দর মানায়। ভাল লাগেনা, তবু এক ঔদ্ধত্যের উষ্ণতায় পারিপার্শ্বিকটুকু বলসে দিয়ে যায় ওরা।

ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে আরতি বলল, "আশ্চর্য্য!"

সন্ধ্যা বলল, "অসম্ভব!"

আর জবা খুব নিচু স্বরে বলল, "বেশ আছে ওরা!"

কেউ অপরের অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করল না। কি, কেন, কে, কোন প্রশ্নই উঠল না আর। শুধু তিনটি অনূঢ়া বিতৃষ্ণ, বিশুষ্ক বিমনস্কতায় বাকি পথটুকু হেঁটে গেল নির্বাক ছায়াছবির মতো।

বিশেষ ব্যস্ত হয়ে সুনয়নী পাড়া বেড়িয়ে বাড়ী ঢুকলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জবাকে বললেন, "সেই আমার কথাই তো রাখতে হলো সকলকে। বলে এলাম দীপুর মাকে, ভাই আর যাকেই মেয়ের বিয়েতে বল, পনেরো নম্বরের নেমন্তন্ন যেন না হয়। তোমায় মেয়ে শ্বশুর ঘরে যাবে, কি দরকার আর পাঁচজনকে জানিয়ে, মালা কাঞ্চনের মতো বন্ধু ছিল তার। উকিলদিদিও আমার কথায় সায় দিলেন।" তারপর একটু শঙ্কিত গলায় বললেন, "কিন্তু তুই জানালায় দাঁড়িয়ে কি করছিলি বলত? এই একটু আগে ছুঁড়ি দু'টোকে রাস্তায় দেখলুম। ওদের সঙ্গে গল্পটল্প করছিল না তো? না, না জবা, তোমার পাড়ায় সুনাম আছে, কখনো যেন সেটুকু নষ্ট না হয়। ওরা দলে মেয়ে খোঁজে। খবরদার, আমি না থাকলে কখখনো ওদের সঙ্গে কথা বলবি না।

জবা নিরুত্তরে নিচে নামে। কলে জল এসেছে। মাজা-ধোয়া কাজগুলো সেরে রাখতে হবে। সারা দুপুর ছিঁচকাঁদুনে বোন বকুলকে ঘুম পাড়িয়েছে। আর ভাল লাগে না। কী ক্ষতি হতো, জবাও যদি মালা কাঞ্চনের মতো উড়ে উড়ে বেড়াত বাইরের পৃথিবীতে? কিন্তু তা

হতে পারে না, সুনয়নী পনেরো নম্বরের সামনে দিয়ে হাঁটতে হলেও তফাৎ রেখে চলেন, যাতে বাড়িটার ইঁট-চুণ-সুরকী তাঁর গা ছুঁয়ে তাঁকে অশুচি করে না দেয়।

দীপালীর বিয়েতে শুধু নিমন্ত্রণ হয়নি পনেরো নম্বরের। কিন্তু তাতেও দমল না কাঞ্চন বা মালা। দীপালী যখন বরের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল আর আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শিরা ঘিরে ধরলেন সে গাড়ি, কাঞ্চন আর মালা তখন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল পনেরো নম্বরের দোরগোড়ায়, একফালি রোয়াকের ওপর।

গাড়ি ছাড়লে সন্ধ্যা আরতির মুখের দিকে তাকাল, আরতি জবার আর জবা অপসৃয়মান মটোরের চাকার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তিনজনেই একবার প্রত্যেকের দেহের খাঁজে খাঁজে দৃষ্টি বুলিয়ে ভাবল, তারা কি অনেক বুড়ি হয়ে যাচ্ছে? তবু কেউ কথা বললে না, সকলেই একটা সূক্ষ্ম ব্যথায় মুসরে পড়েছে; কিসের ব্যথা বোধহয় সেকথাই ভাবছিল তারা।

বাড়ি ফেরার পথে তারা একবার থমকে দাঁড়াল পনেরো নম্বরের সামনে। মালা কাঞ্চন তখন হৈ হৈ ক'রে বাড়ি ঢুকছে, পেছনে চলেছে সেই ডাক্তার ছেলেটি।

মালার উচ্ছল উচ্চ স্বর শোনা গেল রাস্তা থেকেই, "মা, মা, দিদির বিয়েতে আমরাও কা'রকেও বলব না। অ' চিত্তদা আর কতদিন, তাড়াতাড়ি শুভ কাজটা সেরে ফেলুন না বাবা!"

কাঞ্চন কৃত্রিম রাগত স্বরে জবাব দিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, বেশি পাকামো করতে হবে না। ভয় নেই, দেবুকে আমিও বলব, আমার জন্যে আটকাবে না তোর।"

ডাক্তার ছেলেটি হেসে উঠল আর ভেতর থেকে তরুশোভা চাপা গলায় মেয়েকে ধমকালেন, "আঃ, চুপ করনা তোরা। পাড়া মাথায় ক'রে চেঁচামেচির কি দরকার?"

মালা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, "ওঃ, ভারি তো, আমরা এই পাড়াকে ভয় করি নাকি? ভাঙ্‌চি দেওয়ার ভয় তারাই করে, যারা অক্ষম কিম্বা নিজেরা ঐ কাজ ক'রে ক'রে অভিজ্ঞ।"

ডাক্তার বললে, "শুনছেন মাসিমা, মালা আমাদের খুব সক্ষম।"

তরুশোভার গলা শোনা গেল না, শুধু মালার উত্তর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়ে এল, "এই চিত্তদা!" তারপরই এক ঝলক হাসি ছোট্ট ফ্ল্যাটটা ঘিরে ঘিরে গুঞ্জন তুলল।

তিনটি নীরব স্রোতা ছিটকে সরে এল জবাদের বাড়ির দরজায়।

সন্ধ্যা বলল, "কি ডেপো মেয়েগুলো!"

জবা বলল, "হবে না, যেমন শিক্ষা।"

আরতি কিন্তু অত চট ক'রে রাগে না। একটু ভেবে সে বললে, "কিন্তু, শুনতে আমার ভালই লাগছিল ভাই। কেমন সহজ ভাবে ওরা বন্ধুর মতো আলাপ করছিল বলত?"

একদিন সুনয়নীকে পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। রোদের তাপে মুখটা পুড়ে লাল হয়েছে, কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুনয়নী নতুন খবর পৌঁছে দিচ্ছেন

দোরে দোরে—একটা কিছু হচ্ছে পনের নম্বরকে ঘিরে। আজ সকালে এক বিরাট গাড়িতে অনেক লোক এসেছিল। সুনয়নীর স্থির বিশ্বাস, ওরা দেখতে এসেছিল কাঞ্চনকুমারীকে। একটু উদ্বিগ্নও হয়েছেন সুনয়নী। দেবাশীষকেও ওবাড়ি আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে। অথচ উকিলগিন্নি বিন্দু বিসর্গ জানেন না। জবা আর মেয়েরা জানিয়েছে, দেবাশীষের সঙ্গে কাঞ্চনকুমারীর কোন সম্পর্ক নেই, তবে মালার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার নাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হল না। পরদিনই সুনয়নীর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল। তরুশোভা ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করলেন। কাঞ্চনকুমারীর বিয়ে ডাক্তার ছেলেটির সঙ্গে, সকলে যেন একবার উপস্থিত হয়ে ছেলেমেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে যান—একান্ত অনুরোধ জানালেন তরুশোভা। মনে মনে সকলেই বুঝলেন, খুব টেক্কা দিয়েছে তরুশোভা। তবু দ্বিপ্রাহরিক সভায় অভিমত দেওয়া হল, "হাজার হোক্ সামাজিক কাজ, না বলে উপায় আছে তরুশোভার?"

উকিলগিন্নি সুনয়নীকেই আগে প্রশ্ন করলেন, "কি করা যায় বলতো?"

"আপনারা যেই যান দিদি, আমি যেতে পারব না। দেবু যাচ্ছে, আপনিও যাবেন বোধহয়।" শেষ কথায় স্পষ্ট অভিমান এবং ক্ষোভ ঝরিয়ে ফেললেন সুনয়নী।

দীপালীর মা বললেন, "আমার আর যাবার মুখ নেই। দীপুর বিয়েতে ইচ্ছে ক'রেই বাদ দেওয়া হয়েছে ওদের।"

আরতির মা হঠাৎ সকলকে চমক দিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "কিন্তু কেন যে যাব না, তাও তো বুঝি না। মেয়েগুলো যা হোক নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে তো।"

কেমন উদাসভাবে কয়েকটি কণ্ঠ শনশন ক'রে উঠল, "বাপমা'র কত সুবিধে করল। পাত্রও সোনার টুক্‌রো!"

একটা আফশোষের মতো কথাগুলো কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলে প্রফেসর-স্ত্রী শান্ত স্বরে বললেন, "আমাদের যাওয়াই উচিত দিদি।"

সকলে যখন ইতস্তত করছেন তখন সুনয়নী মুখ তুললেন। চোখ দু'টো তাঁর ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের কথায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পনেরো নম্বরের পেছনে তাঁর সক্রিয়তাই ছিল বেশি। আজ হাওয়া ঘুরেছে।

উঠে পড়লেন সুনয়নী। অপরাজিতার অভিমান নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়, বলে এলেন, "তা যান না আপনারা। যাবেনই তো। যার যেখানে আঁচল বাঁধা।" আর এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে ফেরার পথে ভাবলেন, যাবে, অনেকেই যাবে। আরও আগে যাওয়া উচিত ছিল, সুনয়নীরই যাওয়া উচিত ছিল।

দেবদেবের কাছেও সেই এক উত্তর। সব শুনে দেবদেব খানিক বিমর্ষ, খানিক উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন, "বাঃ! বাহাদুর মেয়ে নির্মলবিকাশের। একটি পাই খসল না মেয়ে পার করতে!"

সারারাত ঘুম হল না সুনয়নীর। উকিলগিন্নির উল্টো পাল্টা কথায় আগুন ধরে গেছে মনে। হাটের কথায় কোমর বেঁধে বললেন ওঁর মতো এক বয়স্থা গিন্নি! হবে না, ছেলের টিকি বাঁধা যে ওখানে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। এদিকে জবার মতো মেয়ে হয় না, ওদিকে পনেরো নম্বরেও যাওয়া চাই।

কাঞ্চনের বিয়ের দিন কিন্তু সুনয়নী নিপুণ হাতে মেয়েকে সাজাতে বসলেন।

বিস্মিত জবা জিজ্ঞেস করল, "তুমি যে যাবে না বলছিলে মা?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুনয়নী বললেন, "ওদে ওখানে হাঁদার মতো বসে থাকিস না যেন। আলাপ করবি সকলের সঙ্গে। এই তো তোদের বয়স, আলাপ পরিচয় করবার সময়, এমন কুনো হয়ে থাকলে চলবে কেন?"

বিস্ময় বাড়লো জবার। তবু কথা কইল না সে। মায়ের সাবধান বাণীতে বুকটা আরও বেশি ধক্ ধক্ করতে লাগল। বেসামাল পা পড়ল এখানে সেখানে। আরতি সন্ধ্যা তখনও আসেনি। সুনয়নীই সবার আগে মেয়ের হাত ধরে পনেরো নম্বরে পা দিলেন।

তরুশোভাকে বললেন, "আর ভাই অত ভদ্রতা করতে হবে না। সামনাসামনি বাড়ি। মেয়েরা। কাজ-কর্ম কি আছে দাও। শুধু শুধু এক পেট খেয়ে ফিরতে পারব না।"

তরুশোভা অবাক হলেও হাসিমুখে বললেন, "তা তো বটেই ভাই। আপনারা না দেখলে দেখবে কে?" মালাকে ডেকে বললেন, "জবাকে বসা মালা।"

সুনয়নী মালার দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি ক'রে বললেন, "বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে মালারাণীকে! তুমি মা জবাকে একটু সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিও।"

দেখতে দেখতে সবাই এলেন। আসতে পারেননি শুধু দীপুর মা।

খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল টেবল চেয়ারে। আরতি, সন্ধ্যা, জবা একসঙ্গেই বসেছে। আছেন আরও অনেকে। সুনয়নী মাঝে মাঝে জবাকে এদিক ওদিক থেকে দেখে গেছেন। সবার মাঝে একটা পুঁটলির মতো জবুথবু হয়ে বসে আছে সে। আরতি, সন্ধ্যার মানিয়ে নিতে সময় লাগেনি, কি ছেলে কি মেয়ের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছে তারা। হাজার হোক কলেজের শিক্ষার গুণ আছে, সুনয়নী মনে মনে মেনে নিয়েছেন। শুধু জবাই আজ একা পড়ে গেছে। সুযোগমতো সুনয়নী তাকে আড়ালে ডেকে বারবার অভিযোগ করেছেন, "অমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? আলাপ করতে পারিসনা।"

আলাপ তো করতেই পারেনি। উপরন্তু এতগুলি আলাপীর মধ্যে বসে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় দলছাড়া বলে মনে হয়েছে জবার। ফলও হয়েছে অত্যন্ত খারাপ। টেবলের ওপর থেকে জলের গ্লাস টানতে গিয়ে কাঁপা আঙুলের ঘায়ে উল্টে ফেলেছে নিজের এবং পাশের মেয়েটির পাতায়। ছাদভরে গুঞ্জন উঠেছে। আর সুনয়নী নিজের টেবল্ থেকে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন।

জবার কপালে হাত দিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলেছেন, "তখনই একবার মনে হয়েছিল শরীরটা খারাপ। এতবড় মেয়ে এটুকুও বুঝিস না! গায়ে জ্বর এসেছে বলে মনে হচ্ছে। বাড়ি যেতে তো পারতিস্। কী যে মেয়ে হয়েছে আজকাল, একটা হৈ চৈ করার সুযোগ পেলে আর উঠতেই চায় না।"

তরুশোভা বলেছেন, "শরীর খারাপ? ওমা তা বলতে হয়।"

আরতির মা সস্নেহ গলায় বলেছেন, "আহা, বড় লাজুক মেয়ে।"

কথাটা পছন্দ হয়নি সুনয়নীর। স্নিগ্ধপ্রভার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে মেয়ের হাত ধরে নিচে নেমে গেছেন। বিমূঢ় জবা কিছুই বলতে পারেনি।

নিচে নেমে চাপা বিরক্ত গলায় জবাকে তিরস্কার করলেন সুনয়নী, "কিছু শেখনি হাঁদা অলবড্ডি মেয়ে? তোকে নিয়ে একটা ভদ্রসমাজে বসা যায় না। আরতি সন্ধ্যাকে দেখে শেখ!"

"তা মেয়েকে বকলে কি হবে দিদি। আপনিই তো কিছু শিখাননি। কারও সঙ্গে মিশতে দেননি। কেবল লজ্জাশীলা করে ঘরের কোণে বসিয়ে রেখেছেন।"

সুনয়নী চমকে উঠলেন। শত্রুতার কি সীমা নেই? পেছন পেছন নেমে এসেছে, প্রফেসর-স্ত্রী, সঙ্গে উকিলগিন্নি। উপদেশ দেবেন কি উনিও?

"আর ওকে বকনা বাপু। সবাই কি তড়িৎ ঘটি হয়।" উকিলগিন্নিও কথা বলেন।

তড়িৎ ঘড়িৎ অর্থাৎ স্মার্ট? রাগে জ্বলে যান সুনয়নী। আত্ম ছেড়ে উকিলগিন্নিও তবে হাওয়ার গতিতে গা এলিয়েছেন?

একটাও কথা না বলে বেরিয়ে আসেন সুনয়নী। পেছনে পনেরো নম্বরের সানাইটার সুর কাঁপছে, কাঁপছে জবার চোখের অশ্রুসিক্ত পল্লবের মতো।

দোতালায় এসে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন। অনেক নিমন্ত্রিত তখন পনেরো নম্বরের দোর দিয়ে আনা-গোনা করছে। ধীরে ধীরে জানালার কবাটটা টেনে দিলেন সুনয়নী নিজের হাতে।

বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও রামরাম বসু

সলিলপ্রসাদ ঘোষ

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয় খৃষ্টীয় দশম শতকে, অর্থাৎ যখন থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল, কিন্তু এই বাংলা গদ্য চলিত ছিল তখন বাঙালীর মুখে মুখে, তার কোনও লিখিত রূপ প্রচলিত ছিল না। তখন সব কিছুই লিখিত হতো কাব্যের আকারে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে চর্যাপদ, যা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে পরিচিত—এগুলো সবই কিন্তু পদ্য সংগ্রহ।

এরপর ধীরে ধীরে দানপত্রে, দলিলে, দস্তাবেজে বাঙালীর মুখের গদ্য একটা লিখিত রূপ নিতে সুরু করে এবং বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এসে অষ্টাদশ শতকে তা ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়ে এক নবরূপ লাভ করে। এরপর শ্রীরামপুর মিশনের টমাস্, কেরী ও মার্সম্যান প্রভৃতি মিশনারীরা বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় করতে এগিয়ে আসেন, যদিও এঁরা এসেছিলেন নিজেদেরই প্রয়োজনে, ধর্মপ্রচারের তাগিদে, তবুও বাংলা নতুন গদ্য সৃষ্টির কাজে তাঁদের অবদান কম নয়। বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে এঁদের নাম চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

এই টমাস্, কেরী—এঁরা ছিলেন বিদেশী, আর শুধু বিদেশী নয়, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের লোক; অথচ এঁরাই বাংলা নতুন গদ্যের ঠিক জনক না হলেও, জেষ্ঠতাত বা খুড়োমশাই বলে পরিচিত! এটা কি করে সম্ভব হয়? তবে নিশ্চয়ই এঁরা অন্য কারও কাছ থেকে বাংলা তথা বাংলা গদ্য লিখতে শিখেছিলেন। ঠিক তাই। টমাস্ ও উইলিয়ম কেরী, এঁদের দুজনেরই একজন গুরুমশাই ছিলেন,—তিনি হচ্ছেন রামরাম বসু; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে বাংলা গদ্য প্রবর্তিত হয়েছিল,—তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

এই রামরাম বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্মস্থান ছিল চুঁচুড়া এবং তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ২৪ পরগণার নিমতা গ্রামে। এর বেশী তাঁর বাল্যের ও কিশোর কালের কিছুই জানা যায় না। তাঁকে তারপর দেখা যায়, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী, মিঃ উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্সী রূপে। রামরাম বসু তখন ফার্সীতে পণ্ডিত হয়েছেন, ইংরেজীতে কথা বলতে শিখছেন এবং বাংলা গদ্য রচনায় হাত পাকাচ্ছেন। চেম্বার্স বাইবেলের 'সেন্ট ম্যাথু' অনুবাদ ক'রতেন ফার্সীতে আর রামরাম বসু তাকে আবার বাংলায় রূপান্তরিত ক'রতেন।

এই সময়ে জন টমাস্ নামে এক ইংরেজ জাহাজের চাকরী নিয়ে কলকাতায় আসেন। কিন্তু পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার' ও পরবর্তী কালের পরিচালক চার্লস গ্রাণ্টের পরামর্শে টমাস্ জাহাজের কাজে ইস্তাফা দিয়ে এদেশে খৃষ্টের মহিমা প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু এর জন্য

টমাসের প্রয়োজন হলো বাংলাভাষা শেখার, চার্লস গ্রাণ্ট তারও ব্যবস্থা করলেন, নিজের আত্মীয় উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্সী রামরাম বসুকে নিয়ে এলেন টমাস্‌কে বাংলা শেখানোর জন্য। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ রামরাম বসু টমাসের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এরপর টমাস্ ও রামরাম বসু দু'জনে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ সুরু ক'রলেন; ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসু কতকগুলো 'খৃষ্ট-বন্দনা' রচনা করেন। তার মধ্যে একটি, যেমন:

"এই পৃথিবীতে নাহি কোন জন
নিষ্পাপি ও কলেবর।
জগতের ত্রাণ-কর্তা, সেইজন
জিজ্ঞাসও নাম তাঁহার॥" (১)

টমাস্ এদেশে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়েছিলেন সম্ভবতঃ সেই কারণে, প্রথমেই নিজের গুরুমশাই রামরাম বসুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তিনি নিজের হাতযশ পরীক্ষা ক'রতে গেলেন। তা ছাড়া আর একটা কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে ঐ 'খৃষ্ট-বন্দনা' রচনা, প্রধানতঃ এর ফলেই টমাস্ ও অন্যান্য মিশনারীরাও বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। কিন্তু রামরাম বসু ছিলেন অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, তিনিও এই অবস্থা বুঝে টমাসের সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রতে লাগলেন, যেন তিনি খৃষ্টান হয়েই গেছেন, শুধু দীক্ষাটুকু নিলেই হয়। টমাস্‌ও ভাবলেন, রামরাম বসু আজ হোক কাল হোক একদিন তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে 'অন্ধকার হইতে আলোকে' আসবেন। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেও শেষ পর্যন্ত টমাস্ রামরাম বসুকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে পারলেন না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। মাত্র এক বছর পরেই আবার টমাস্ কলকাতায় ফিরে এলেন, সঙ্গে এবার উইলিয়ম কেরী।

প্রথমে চেম্বার্স তাঁর মুন্সী রামরাম বসুকে দান করেছিলেন টমাস্‌কে, এবার টমাস্ তাঁর গুরুমশাইকে তুলে দিলেন উইলিয়ম কেরীর হাতে। মাসিক ২০ টাকা বেতনে রামরাম বসু কেরীর মুন্সী ও বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তিনি কেরীর সঙ্গে আবার মালদহের মদনাবাটিতে ফিরে এলেন। বাংলা শিখতে উইলিয়ম কেরীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল, কিন্তু অসাধারণ অধ্যাপনার গুণে কেরী অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এরজন্য কেরীও তাঁর গুরুমশায়ের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে রামরাম বসু স্থানীয় একটি বিধবার প্রতি আসক্ত হয়ে এমন একটি অপরাধ করে বসলেন যে, উইলিয়াম কেরীও তাঁকে ক্ষমা করতে পারলেন না। মালদহ থেকে রামরাম বসু বিতাড়িত হলেন। এ সম্পর্কে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে, মদনাবাটি থেকে উইলিয়ম কেরী লিখছেন— (২)

"I have been forced, for the honour of the Gospel, to discharge the Moonshi [Ram Ram Boshu] who—was guilty of a crime which required

(১) সাহিত্য-সাধক চরিতমালা: ১ম খণ্ড।
(২) William Carey. (London 1934): S. Pearce Carey.

this step, considering the profession he had made of the Gospel. The discouragement arising from this circumstances is not small, as he is certainly a man of the very best natural abilities that I have everfound among the natives and being well acquainted with phrasealogy of scripture, was peculiarly fitted to assist in the translation, but, I have now no hope of him."

এরপর রামরাম বসুর চার বছরের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। ইতিমধ্যে উইলিয়ম কেরী মদনাবাটি থেকে শ্রীরামপুরে এসে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতিকে নিয়ে জমিয়ে বসেছেন। চল্লিশ পাউণ্ডে কেনা কাঠের ছাপাখানাটিও শ্রীরামপুরে এসে গেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আবার দেখা গেল, রামরাম বসু অনুতপ্ত হয়ে শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়ম কেরীর কাছে ফিরে এসেছেন এবং পূর্ব্ব পদেই বহাল হয়েছেন। এই সময়ই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী, রামরাম বসু টমাস্ ও কেরী—তিনজনের অনুবাদিত "ম্যাথুলিখিত সুসমাচার" শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

এর আগে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেসলী ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এদেশে শাসনোপযোগী শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করলেন, তখন তার বাংলা বিভাগের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে রামরাম বসুও সহযোগী পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হলেন। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হলেন, স্বয়ং উইলিয়ম কেরী।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, পণ্ডিত সবই নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু তাঁরা পড়াবেন কি? বাংলা বই কোথায়? উইলিয়ম কেরী তখন নিজে বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা কথোপকথন সঙ্কলন করতে সুরু করলেন। মৃত্যুঞ্জয় ও রামরাম বসুর ওপর বাংলা ইতিহাস ও সাহিত্য রচনার ভার দিলেন। এই সময়ে উইলিয়ম কেরী লিখছেন: (৩)

"I got Ram Boshu to compose a history of one of the Kings, the first prose book ever written in the Bengali Language,"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও গোলক শর্ম্মাও রামরাম বসুর সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ সুরু করেছিলেন, কিন্তু চরিত্রভ্রষ্ট হলেও তিনি ছিলেন প্রতিভাধর পুরুষ, সকলকে পেছনে ফেলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হলো রামরাম বসু রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"। বাংলা ভাষায় এইটিই সর্ব্বপ্রথম মৌলিক গদ্য পুস্তক।

সামনে যখন কোনও বাংলা গদ্যের আদর্শ ছিল না, সেই সময় রামরাম বসু সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ফার্সী মিশিয়ে বাংলা গদ্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং সেই গদ্যই পরিমার্জিত হয়ে পরবর্তী কালে শক্তিশালী বাংলা গদ্য হয়ে উঠেছে—একথা আজ চিন্তা করলে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের এতটুকু সম্পর্ক আছে, তাঁরা সকলেই মনে মনে রামরাম বসুর জন্য গর্ব্ব অনুভব না করে পারবেন না; অথচ এই মৌলিক গদ্য পুস্তক তথা বাংলা প্রথম উপন্যাসটিকে বহু শাস্ত্রীয় পণ্ডিতই

(৩) Memoirs of William Carey, D.D. (P.P. 269); Eustace Carey.

'অপাঠ্য কদর্য' (৪) বলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন থেকে দূরে রাখবার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যে গলদ থাকবেই। আজকের বাংলা গদ্যের পাঠক "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" পড়তে গিয়ে ফার্সী আরবী শব্দের কণ্টকজালে পথ হারাবেন, ব্যাকরণের দোষও তাঁদের বিরক্তির কারণ হবে—এ সবই সত্য, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, রামরাম বসু যে যুগে জন্মেছিলেন, তখনকার অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন পাঁচ ছ'শো বছরের মুসলমানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং আদব কায়দার জারক-রসে জরিত। মকতব আর বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সঙ্গে আরবী-ফার্সীরও পাঠ দেওয়া হতো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সীমিত সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল সংস্কৃতের অনুশীলন। সাধারণ মানুষ তাদের কথাবার্তায় বাংলার সঙ্গে আরবী-ফার্সী শব্দই ব্যবহার করতো বেশী। যেমন দেড়শো দু'শো বছর ইংরেজের শাসনে থেকে আজ যখন আমরা চেয়ারে বসি, পেন দিয়ে লিখি, আর ট্রামে চড়ে কলেজ যাই—এতে যেমন কেউ আমাদের দোষ ধরে না, সেদিনও তাই ছিল। "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র"এর ভাষার নমুনা:

"যেকালে দিল্লীর তক্তে হোমায়ু বাদশাহ তখন ছোলেমান ছিলেন বঙ্গ ও বেহারের নবাব। পরে হোমায়ু বাদশাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্থানের বাদশাহ হইতে ব্যস্ত হইল এ কারণ হোমায়ু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল, ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগাদা কিছুই হইতাছিল না।"

এই আরবী-ফার্সীর কণ্টকজাল কাউকে বিস্মিত ও বিরক্ত করেনি, বিশেষ করে বিদেশী সিবিলিয়ানরা, যাঁদের জন্য এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাঁরা সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষার চাইতে এই উল্লেখিত ভাষাতেই ছিলেন বিশেষভাবে অভ্যস্ত। সেদিক থেকেও বিচার করলে রামরাম বসুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

এই "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" রচনা ক'রবার কৃতিত্বের জন্য কলেজ কাউন্সিল রামরাম বসুকে তিনশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকেই ১৮০১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ইংরেজী আখ্যাপত্রটি এই রকম:

"The History of Raja Pritapaditya: By Ram Ram Boshu, one of the Pundits in College of Fort William. Serampore, Printed at the Mission Press. 1802"

কিন্তু এই ১৮০২ খৃষ্টাব্দটি ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত, তা আজ আর জানবার কোনও উপায় নেই।

"রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র" প্রকাশিত হবার এক বছর পরেই রামরাম বসুর দ্বিতীয় গ্রন্থ "লিপিমালা" প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থখানিকে বাংলা পত্রসাহিত্যের অগ্রদূত বলা যায়। এতে মোট চল্লিশটি লিপি আছে আর তার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুর অভাব নেই। রাজা রাজাকে, রাজা ভৃত্যকে, কিম্বা পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমান সমানকে প্রভৃতি পঁচিশখানা

(৪) "বাঙ্গালা সাহিত্য": হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, (বসুমতী সংস্করণ)।

চিন্তাকর্ষক পুত্র আছে। এই সব পত্রে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কথা যেমন স্থান পেয়েছে, ঠিক তেমন আবার প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি, নবদ্বীপের কথা ও শ্রীগৌরাঙ্গের কথাও আছে।

"লিপিমালা" যথেষ্ট মধুর ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ, অবশ্য সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে। এতে আগের গ্রন্থের মত ফার্সী-আরবী শব্দের চড়াই উতরাই নেই, রচনারীতিও সহজ সরল পথে এগিয়ে গেছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে রামরাম বসুর বাংলা গদ্য যে কত উন্নতি লাভ করেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে "লিপিমালা"র প্রতি ছত্রে ছত্রে। যেমন—

"ওখানকার সমাচার অনেক দিবস না পাইয়া একান্ত ভাবিতেছিলাম এখন শ্রীবিজয় গোপাল ঘোষের হাত পাত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিত হইলাম। লিখিয়াছেন আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে তাহার কুল মর্যাদা একশত টাকা দিতে হইবেক এ সম্বন্ধ ভাল বটে কিন্তু টাকার সাংগত্য বৃহৎ ব্যাপার…"

"রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র", "লিপিমালা" ছাড়াও রামরাম বসুর রচনা-নৈপুণ্যের ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় রয়েছে "হরকরা বা গসপেল মেসেঞ্জার" (১৮০০ খৃঃ), "জ্ঞানোদয়" (১৮০০ খৃঃ) এবং "শ্রীষ্টবিবরণামৃতং" (১৮০৩-৫ খৃঃ) নামে খৃষ্ট বন্দনা বা কবিতায় খৃষ্ট চরিত বর্ণনার মধ্যে। টমাস্, মার্সম্যান, কেরী প্রভৃতি মিশনরীগণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, সে যুগে রামরাম বসুর মত ইংরেজী ও বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ, সাহিত্য-বোদ্ধা লেখক বিরল ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেই রামরাম বসুর জীবনের বাকী দিনগুলো কেটে গিয়েছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট রামরাম বসু ইহলোক ত্যাগ করেন। রামরাম বসুর জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই সে যুগের মিশনরীদের পত্র-পত্রিকার মারফৎ জানতে পারা যায়। যদিও কেরী প্রভৃতি কয়েকজন মিশনরী রামরাম বসুর প্রতিভা ও বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন, কিন্তু অন্যান্য মিশনরীগণ, খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ না করায় রামরাম বসুর ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় রামরাম বসুর নৈতিক চরিত্রের দোষ-ত্রুটিগুলিকে বড় করে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ হিসাবে রামরাম বসু ছিলেন, একেবারে সংস্কার-মুক্ত, নীতি ধর্মের কোনও বাঁধাই তিনি মানতেন না। জাল-জুয়াচুরী থেকে সুরু করে ভ্রূণ হত্যা (৫) পর্যন্ত তিনি কিছুই বাকী রাখেন নি।

কিন্তু সেই যুগের সেই পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে নৈতিক চরিত্রের দোষ-ত্রুটিগুলোকে বড় করে না দেখে, রামরাম বসুর স্ফুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার কথা আমাদের চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। রামরাম বসু সম্বন্ধে শেষ কথা হচ্ছে এই যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর নাম চিরদিন বাঙালীর মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

(৫) The Life of John Thomas (1873) P.P. 294-95 : C. B. Lewis.

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'

রথীন্দ্রনাথ রায়

॥ ৩ ॥

'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতি, কিন্তু অরণ্যজীবনের বিভিন্ন লগ্নে অনেকগুলি ছোটখাটো কাহিনী শাখা-বিহঙ্গের মত অরণ্য-বনস্পতিতে নীড় রচনা করেছে—এই কাহিনীগুলিই আরণ্যক উপন্যাসের শাখা-কাহিনী। অরণ্যের প্রশান্ত-মধুর শ্যামলিমায়, ভীষণ রমণীয়তায়, অপার স্তব্ধতায় ও শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রায় এই সব কাহিনী ও চরিত্র বহু হ'য়েও এক। আদিম অরণ্যছায়ায় মানব-চরিত্রের কত ভীড়, কত আপাত-বৈচিত্র্য! অধ্যাপক মটুকনাথের উদার-শান্ত জীবনাদর্শ, সৌন্দর্য্যসাধক মুগলপ্রসাদের গভীর রাত্রে নির্জন অরণ্য-বিচরণ, কবি বেঙ্কটেশ্বরের গ্রাম্য অথচ সহজ কবিপ্রাণ, সাঁওতালরাজ দেবারুপান্নার আন্তরিক আতিথেয়তা, নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়ার শিল্পপ্রাণতা, তরুণী ভানুমতীর সুকুমার হৃদয়াবেগ জীবনরসে উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে। রাখালবাবুর বিধবা পত্নী, দরিদ্র বাঙালী পরিবারের অনূঢ়া কন্যা ধ্রুবা-জবাও একটি ছোট্ট উপকাহিনীর সৃষ্টি ক'রেছে, কুন্তার জীবনকাহিনীও মানবীয়-রস-সমৃদ্ধ। কতকগুলি অপ্রধান গ্রাম্যচরিত্রও অরণ্যজীবনের বিস্তৃত মঞ্চে ক্ষণিকের জন্য এসেছে, কিন্তু সেই ক্ষণটুকুর মূল্যও কম নয়।

বিভূতিভূষণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মূলকাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনীকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর পদ্ধতি দু'টি: এক, অরণ্যজীবনের আহ্বান-তৎপর ছত্রছায়া, দুই, লেখকের সমগ্র ও আন্তরিক দৃষ্টি। এই দু'টি সূত্রে সমগ্র বিচ্ছিন্ন-কাহিনী, অনেক টুকরো কথা, অনেক ক্ষণিক আবেদন, পলায়নপর অনেকগুলি মুহূর্ত একটি ধ্রুপদী-মহিমায় বাঁধা পড়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে যে পার্থক্য তা বহিরাশ্রয়ী মাত্র, আন্তরিক নয়। অরণ্যজীবনের এক সুগভীর মর্মস্পন্দন প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঝঙ্কৃত হ'য়েছে। চরিত্রগুলি যেন অরণ্যগাথার এক একটি শ্লোক—তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও নিগূঢ়ভাবে তারা এক। নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া যেন সরস্বতীকুণ্ডের নৃত্যশীল জলধারা, সৌন্দর্যসাধক মুগলপ্রসাদ যেন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঝরে-পড়া জ্যোৎস্না, সাঁওতালরাজ দেবারুপান্না যেন অরণ্যজগতের আপাত-রিক্ত মহিমা, তরুণী ভানুমতী যেন অরণ্যজীবনের শ্যামল পত্রাভরণ, বিহার-প্রবাসী বাঙালী কন্যারা যেন মৃত্তিকার কঙ্করময় অতি কর্কশ জীবনযাত্রার প্রতীক। এই জগতে আনন্দবেদনা, বিরহ-মিলন যেন এক সূত্রে বিধৃত, সেখানে লাভ-ক্ষতির ভেদরেখাটুকুও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়—শুধু জেগে থাকে সুবৃহৎ অরণ্যভূমি, মায়াময়

রাত্রি, পীতবর্ণের জ্যোৎস্নাভরণ ও একটি সহজ কবিমন। এমনি করেই বিভূতিভূষণ বিচিত্রকে এক ক'রেছেন, আপাত পার্থক্যকে মহাসমন্বয়ের সুরে ভ'রে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণের মানব ও প্রকৃতির এই সম্পর্ক চিত্রণ অতি সহজেই কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতি সাধারণ চরিত্র ও তুচ্ছ ঘটনা তাঁর অতীন্দ্রিয় জিজ্ঞাসাকে তীব্রতর ক'রেছে। কর্মনিরতা একটি বালিকার নির্জন-সঙ্গীত, অথবা অস্তসূর্যের আলোয় হ্রদের ধারে আর একটি বালিকার প্রশ্নচঞ্চল কণ্ঠ অথবা পার্বত্যপ্রদেশে জৌক অনুসন্ধানকারী একজন গ্রামবৃদ্ধের আত্মকাহিনী-বিবৃতি—প্রভৃতি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এক অপার্থিব রহস্যানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। তবুও তাঁর সমস্ত চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে গাঁথা নয়, তাঁর কবিতায় এমন চরিত্রও আছে, যা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয় নি: "Among the pictures which Wordsworth has left us the influence of Nature on human character, Peter Bell may be taken as marking one end, and the poems on Lucy the other end of the scale. Peter Bell lives in the face of Nature untouched alike by her terror and her charm; Lucy's whole being is moulded by Nature's self; She is responsive to sun and shadow, to silence and to sound and melts almost into an impersonation of a cumbrian valley's peace."—(Wordsworth: Myers) কিন্তু বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলিতেও সর্বত্র প্রকৃতির প্রভাব একই প্রকার তা বলা যায় না। কোন কোন চরিত্রে প্রকৃতির প্রভাব কেন, বিশুদ্ধ প্রকৃতিকেই পাওয়া যায়। 'আরণ্যকে' প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি চরিত্র দুটি: নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া ও সৌন্দর্যসাধক যুগলপ্রসাদ। ধাতুরিয়া যেন অরণ্যের চঞ্চল মৃগ—তেমনি নৃত্যশীল ও ক্রীড়াপরায়ণ—তার বিস্ফারিত চোখে সভ্যজগৎ সম্পর্কে বিস্ময়কর কৌতূহল! ধাতুরিয়ার আবির্ভাব যেমন অকস্মিক, তিরোধানও তেমনি। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে তার মৃত্যুর চিত্রটি বেদনার নীলরেখার মতো জেগে থাকে। ধাতুরিয়া যথার্থ শিল্পী—সে অর্থলোলুপ নয়, নিজের ভালোমন্দ বোঝে না, শুধু বোঝে তার শিল্প। সে অনাসক্ত। তার যথার্থ গুরু কেউ নেই—হয়তো বর্ণধারার নিকট, হয়তো বনহরিণীর নিকট, হয়তো বা অতি পরিচিত নীল গাইয়ের নিকট সে তার শিল্পের দীক্ষা নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর (গল্পগুচ্ছ: দ্বিতীয় খণ্ড) সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। তারাপদ সঙ্গীতমুগ্ধ, অনাসক্ত ও বন্ধন-ভীরু। ধাতুরিয়া চরিত্র অধিকতর মানবীয়—সেইখানে তার চরিত্রের আড়ালের একটি করুণ সঙ্গীত বেজে উঠেছে। উদ্ভিদ-তত্ত্ব-বিশারদ সৌন্দর্যরসিক যুগলপ্রসাদ আর একটি প্রকৃতি-মানব। গভীর রাত্রিতে এক আদিম মৃত্তিকা তাকে আহ্বান করে। লতা পাতা ফুল প্রভৃতির সঙ্গে তার কী নিবিড় আত্মীয়তা! এমন ক'রেই যুগলপ্রসাদ তার 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' সাধন করে। সরস্বতী কুণ্ডীতে বনভোজনরত রায়বাহাদুর ও তার দলটি এই অরণ্যজগতের সঙ্গে একেবারেই মিলতে পারে নি—এই দলটি যেন ধাতুরিয়া ও যুগলপ্রসাদের বিপরীত কোটি। অন্যান্য চরিত্র এই দুই কোটির মাঝামাঝি।

এমন কি বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী মেয়েদের চরিত্র তাদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আভিজাত্যহীন অনাড়ম্বর অরণ্যজীবনের সভ্যসদ হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাগরিক জীবনের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে যেখানে লোকচক্ষুর অগোচরে অরণ্য-প্রকৃতির একটি নিজস্ব কাহিনী আছে, সেখানে এই সব চরিত্রও লতা-পাতা-ফুলের মতো ফোটা-ঝরার সমতাল রক্ষা ক'রে চলেছে। অরণ্য-মর্মর থেকেই তাদের উদ্ভব—তাই অরণ্যমণ্ডলী থেকে তাদের পৃথক ক'রে দেখা সম্ভব নয়—কালিদাসের ভাষায়—দৌহপি অত্র অরণ্যাকৌ।

॥ ৪ ॥

বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ এক নির্জন প্রান্তবাসী! এর জন্য দায়ী তাঁর মানসিক প্রকৃতি। যে যুগে তাঁর মানসজীবন গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য কম নয়। বহু শাখায়িত সমস্যা যখন আমাদের দেশ ও কালকে নানাদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন বিভূতিভূষণ যে জগৎ তুলে ধরলেন তার স্বাদ স্বতন্ত্র, রস নূতনতর। যুগ-জীবনের বিভ্রান্তি, সমস্যার করাল ছায়া, জীবনের অবসাদ ও বিকৃতি কোন কিছুই যেন বিভূতিভূষণকে স্পর্শ করে নি। জীবনের যে রস পিপাসা আনন্দ ও সৌন্দর্যের মহাভাষ্য রূপে দেখা দিল, তা-ই প্রকৃতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। সহজ জীবনের রূপকার সহজ প্রকৃতির রূপকার হ'য়ে উঠলেন। কবি বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় অতি সহজেই ধরা দিল লবটুলিয়া বইহারের আরণ্যক প্রকৃতি, মোহনপুরা এস্টেটের পার্বত্য অঞ্চল, সরস্বতী কুণ্ডের জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারা।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের কবি ও কথা-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি থেকে এ দৃষ্টি স্বতন্ত্র। সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে বিশ্বপ্রকৃতি আর কোথাও এমন ক'রে ধরা দেয় নি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বাংলাদেশের আর এক আঞ্চলিক প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের প্রাণ, কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও প্রকৃতির ছাপ মানবচরিত্রের ওপর সব সময় তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কালিন্দী উপন্যাসে কালিন্দীর চর নিঃসন্দেহে চিত্র নয় চরিত্র, কিন্তু মানবজীবনের ওপর তার প্রভাব তেমন নিগূঢ় নয়। 'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশাল অরণ্যানীর যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের বিশ্বপ্রকৃতি বর্ণনায় প্রধানতঃ একটি সুরেরই লীলা। একটি বিশ্বাসমুগ্ধ কবিদৃষ্টি উপন্যাসটির সর্বত্র প্রসারিত—প্রকৃতির নিষ্ঠুর হাসি, নির্মম প্রতিহিংসা ও ধ্বংস-করালমূর্তি এখানে অনুপস্থিত। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি লালন-পরায়ণা, চিরসহিষ্ণু, ক্ষমাশীলা মাতৃহৃদয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্বপ্রকৃতি-চিত্রণ প্রসঙ্গে হাক্সলির মন্তব্যটির কথা মনে পড়ে: "A few weeks in Malaya or Borneo would have undeceived him. Wandering in hothouse darkness of the jungle, he would not have felt so serenely certain of those "Presnece of Nature", those "Souls of lonely places" which he was in the habit of worshipping on the shores of windermere and the Rydal."—(Wordsworth in the Tropics: Aldous Huxley)

বাংলাদেশের কোন অখ্যাত পল্লী অঞ্চল হোক, অথবা গয়া জেলার অরণ্যানী হোক্, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিকোণের কোন পরিবর্তন ঘটেনা। আরণ্যক উপন্যাসের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে মিয়মন্ত্রণ করেছে এক দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাপ্রকৃতি। আরণ্যক জীবন অসংস্কৃত, আদিম। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে যে একটি ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রকৃতি যেমন অনায়াস-বন্য, মানুষও তেমনি বন্য হয়েও সহজ ও প্রকৃতি-অনুগ। টমাস হার্ডির উপন্যাসে Egdon Heath-এর যে বিশাল আকর্ষিত প্রান্তরের অসাধারণ চিত্র আছে তার ভয়াবহ রহস্য ও মানব ভাগ্যের ওপর নিষ্করুণ ছায়াসম্পত এক অখণ্ড সঙ্কেত ঘনিয়ে তোলে। Egdon Heath-এর অনুর্বর, আদিমতা, জড় প্রকৃতির ক্রূর কুটিল রহস্যের মহাকাব্যোচিত প্রসার লবটুলিয়া বইহারের অরণ্য প্রকৃতির চেয়েও বিস্তৃত ও গভীর। কিন্তু হার্ডির নিয়তিবাদ ও দুঃখবাদের স্বরূপ এই বিশাল প্রকৃতিচিত্রটিকে এক ক্ষমাহীন অন্ধ শক্তিতে পরিণত করেছে। তাঁর "দি রিটার্ণ অব্ দি নেটিভ" গ্রন্থে Egdon Heath-এর এই অন্ধ প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "In Hardy's novels it may not be fate that is shown working through us, but it is certainly the earth working through us, both the earth and ourselves being part of the expression of the Immanent Will, or you prefer, the blind Creative Principle."—প্রকৃতির এই মূর্তি বিভূতিভূষণের কবি-প্রকৃতির অনুকূল নয়। বিভূতিভূষণের বিশ্বপ্রকৃতি ধ্যানমৌন, স্বপ্ন-সুন্দর, রহস্য-নিবিড়, তবু তাঁর বিশালছায়ায় এক একটি লোকালয় লালিত হয়। বিভূতিভূষণের অরণ্য শেষ পর্যন্ত যন্ত্রদানবের কাছে ধরা দিয়েছে। কিন্তু হার্ডির প্রকৃতি আদিম, বর্বর ও অপরিবর্তনীয়, তেমতি তার ক্রূরতা: "The untamable, Ishmactitish thing that Egdon now was it always had been. Civilisation was its enemy, and ever since the beginning of vegitation its soil had worn the same unique brown dress, the natural and invariable garment of the particular formation."

প্রকৃতির মাধ্যমে বিভূতিভূষণ রোমান্সের ধারাকে পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। এবং রহস্যময় আদিম প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে জীবন ও জগৎ-সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। প্রকৃতির একদিকে আদিম অরণ্যভূমি, অন্যদিকে অন্তরীক্ষ—এক দিকে আদিম লোকায়ত সংস্কৃতি, অন্ধ কুসংস্কার, সরল আদিম বিশ্বাস; অন্যদিকে তাঁর রোমান্স-প্রবণ মনের কবিত্বময় অনুভূতি: "কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ে সে কি আনন্দ। সকলের উপর কি একটা অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না, কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।"—কবি বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিকের বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে অনুভূতির অতলে ডুব দিয়েছেন। এই গভীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি বিভূতিভূষণের প্রকৃতিরসের প্রাণ: "যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজীর মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতের নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্য্যের

জন্ম, নব নব প্রাণের বিকাশ কীরূপে নিহিত!"—প্রকৃতির এই লীলা-সুন্দর আনন্দরূপের উপাসক তিনি। হার্ডির উপন্যাসে "এগ্‌ডন হীথে"র ভয়াবহ রহস্যের দানবীয় বজ্রমুষ্টির নীচে মানুষ নিয়তি-পিষ্ট।

যন্ত্র-সভ্যতা ও আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি কলকাতার উপকণ্ঠের অধিবাসী হয়েও বিভূতিভূষণ সুদূর অতীত অথবা রহস্যময় পল্লীপ্রকৃতির স্বপ্নে আবিষ্ট। 'আরণ্যক' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে এই যন্ত্র-জীবিত জীবনের প্রতি বিক্ষোভ ফুটেছে। এখানে হার্ডির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত মিল। যা অপরিবর্তিত, প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার প্রতীক, সভ্যতা যাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি—তাকেই তাঁরা রূপ দিয়েছেন। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার তিনটি ধাপ—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এ প্রকৃতি থাকলেও, মানুষ গৌণ নয়। 'আরণ্যকে' দ্বিতীয় ধাপ—এখানে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। 'আরণ্যকে'র পরে আর একটি চেতনাও দেখা দিয়েছিল—সেখানে মানব অথবা প্রকৃতি, কোনটিই মুখ্য নয়—সেখানে অপুর রেলগাড়ী নেই, অরণ্য-জমিদারীর ম্যানেজার বাবুর ঘোড়াও নেই—সে এক জ্যোতিবাহিত পথ—আলোক রথ—মুক্ত শুভ্র দেবযান।

'আরণ্যকে'র পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহে প্রকৃতি আছে, কিন্তু সে প্রকৃতি লোকলয়-ঘনিষ্ঠ—সাধারণ বাংলা দেশের গার্হস্থ্য জীবন থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়নি। 'আরণ্যকে' লোকালয় থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখানো হয়েছে। সেখানকার লোকালয়গুলি যেন বিশ্ব-প্রকৃতির দয়ায় তাদের সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু নিয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্য ও ঋতুনাট্যগুলিতে প্রকৃতির আর এক ঐশ্বর্য্য-দীপ্ত মূর্তি ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির চূড়ান্ত ধাপে সঙ্গীত ও নৃত্য মাধ্যম। বিভূতিভূষণ কথাসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার তাঁর ছিল না। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কল্পনা-প্রসার, উজ্জ্বল বর্ণনা অর্থগূঢ় সাঙ্কেতিকতা উপন্যাস ও কাব্যের এক ছন্নিরীক্ষ্য সন্ধিসীমায় উপনীত হয়েছে।

॥ ৫ ॥

বিভূতিভূষণ স্মৃতি-রোমন্থনের সুদক্ষ শিল্পী। গড়ের মাঠে বসে কলকাতার কোলাহলক্লান্ত অপরাহ্নে বিভূতিভূষণ ফেলে আসা দিনের স্মৃতিসূত্র অনুসরণ করে এক রূপকথা-মুগ্ধ জগতের ছবি এঁকেছেন। তাই উপন্যাসটি এক হিসেবে স্মৃতিচিত্র।—এতে স্মৃতির রসও আছে এবং বর্ণের বর্ণনাও আছে। গল্প ও কথাচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনা ও কল্পনার মসৃণ-চিকণ সূক্ষ্ম বয়ন লেখকের মনোলোকের শিল্পিত রূপের পরিচয় দেয়। এই আবিষ্ট মনের ভাবনার বাতাবরণের মধ্যেই বিভূতিভূষণের মানসলোকের ছায়া-সঞ্চরণ। সুপ্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে আবিষ্ট-চিত্ত বিভূতিভূষণ ভাবেন: "ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই গ্রাম বটীবটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের!"—এই "সময়ের উজানে" পার হয়ে যাওয়ার রোমান্টিক আকাঙ্খা আরণ্যক উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। স্মৃতির মালা গাঁথার শিল্পে বিভূতিভূষণ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ—ভূলোক-দ্যুলোকের পার্থিব-অপার্থিব সব কিছু

মিলিয়ে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি-রস-প্রবাহ একটি সর্বজ্ঞ ভাবদৃষ্টির কেন্দ্রে যেন সংহত। একাদশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনার্যরাজ দোবারুপান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিপ্রান্তে দাঁড়িয়ে লেখক এক প্রাচীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, মহাকালের যুগান্ত-প্রসারিত রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃতি দেখেছেন—"পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।"

বিভূতিভূষণের এই ভাবুকতার মধ্যে শুধু স্মৃতিরসই নয়, তার সঙ্গে এক ঐশী-চেতনার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অনুভবও অলক্ষ্যগোচর নয়। সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্পে, দরিদ্র অন্ত্যজ পরিবারে, মহালিয়ারূপ পাহাড়ে, স্থল-জল-অন্তরীক্ষে সেই একই আনন্দরূপের প্রকাশ। এখানে বিভূতিভূষণ তাই সহজেই বলতে পারেন: "আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীন বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাড়া বইহারের কি আত্মিমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্ত মেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন!"

এই প্রীতি-সমুজ্জ্বল ও ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ওপরেও পড়েছে। কুণ্ডার দুঃখক্লিষ্ট জীবনের প্রতি সহানুভূতি, বৃদ্ধত্ব তরুণী ভার্যা মঞ্চীর গৃহত্যাগের পরিণাম চিন্তায় বেদনা-বোধ, বাঙালীঘরের অনূঢ়া কন্যা ধ্রুবার কাহিনীকে কল্পনায় ও বেদনায় নূতন স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করা, রাজু পাঁড়ের পূর্বরাগের অন্তরালে একটি সহজ গ্রাম্য জীবনের রস আবিষ্কার করা প্রভৃতি একটি চিত্র-সংগ্রহ করুণ-সুন্দর ভাবনা বিভূতিভূষণের বিশেষ ধরণের জীবনদৃষ্টি থেকেই উদ্ভূত। প্রবাসী বাঙালী কন্যা ধ্রুবার সমবেদনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাবোর উপেক্ষিতা'র অনুসূয়া-প্রিয়ংবদার কথা মনে পড়ে: "শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি"।

কিংবদন্তী অথবা লৌকিক প্রবাদ অবলম্বন ক'রে অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনা করা বিভূতিভূষণের একটি স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। 'বড় চণ্ডীর মাঠ', 'ধুঁটি দেবতা', 'অভিশপ্ত', 'হাসি' প্রভৃতি গল্পে লৌকিক কিংবদন্তী সমূহের মধ্যে তিনি এক গূঢ় ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত ক'রে এক প্রেত পিঙ্গল বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে কয়েকটি অতি-প্রাকৃত চিত্রণ আছে—সেগুলি প্রধানত স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রামচন্দ্র আমীন, আসরফি টিণ্ডেল, বোমাইবুরু বৃদ্ধ ইজারাদার ও তার তরুণ পুত্রটিকে নিয়ে যে নাতিদীর্ঘ কাহিনীচক্রটি রচিত হ'য়েছে তার অতি-প্রাকৃতরস একটি নিগূঢ় অর্থ-

সঙ্কেতে ভ'রে উঠেছে। জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি এখানে এক অপরীরী প্রতিহিংসার প্রতীকরূপিণী হ'য়ে উঠেছে। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে বিরাটাকৃতি বন্য মহিষের দেবতাটির অতি-প্রাকৃত বর্ণনাও সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। মোটকথা, 'আরণ্যক' উপন্যাসের অতি-প্রাকৃত বর্ণনায় এমন কিছু অসাধারণ পরিবেশ অথবা উপাদানের প্রয়োজন হয় নি—লেখক 'মিথ্'কে সহজেই শিল্প ক'রে তুলেছেন।

'আরণ্যক' উপন্যাসে শিল্প ও যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ বিরূপতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের মানসিক গঠনই তার জন্য দায়ী। 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় 'অপরাজিত'র নিকৃষ্টতার এও একটা কারণ। নাগরিক জীবন অথবা সহরতলীর জীবনযাত্রা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নিতান্ত বর্ণবিরল। শরৎচন্দ্র পল্লীচিত্র এঁকেছেন, কিন্তু সে ছবির সঙ্গে বিভূতিভূষণের পল্লীচিত্রের পার্থক্য কম নয়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লী ও পল্লীর মানুষের সমস্যা বাদ পড়ে নি, পল্লী-জীবনের শ্রীহীনতা, দীনতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততাও তার অঙ্গীভূত হয়েছে। বিভূতিভূষণের পল্লী রোমান্স-রসের কেন্দ্রভূমি—যেখানে "কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।"—সেখানে লেখকের বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি পল্লীপ্রকৃতির ওপরেই নিবদ্ধ, পল্লীর মানুষ যেন একটু অন্তরালে। জীবনের বৈচিত্র্য এখানে একটু কম—সংঘাতহীন, নিস্তরঙ্গ কিন্তু মধুর। 'আরণ্যকে'র প্রস্তাবনা অংশে লেখক যে বেদনার কথা নিবেদন ক'রেছেন, সেই বেদনা গ্রন্থটির সর্বাংশে ছড়িয়ে আছে: "কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবে না জানি।"—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ তৃতীয় অধ্যায়ে অরণ্যরুৎ ও নূতন গড়ে-ওঠা লোকালয়ের পাশাপাশি দু'টি ছবির ভেতর দিয়েও লেখকের মনের প্রতিক্রিয়াটি সুন্দর ধরা পড়েছে: "প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাড়া-বইহার, অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে? কতকগুলি গোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের খেত, শোণের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণি-মনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক। হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।"—মানুষ-বিবর্জিত বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রশস্তি লাভ ক'রেছে। কেউ কেউ জীবনানন্দের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা করেছেন। তুলনাটি বহিরাশ্রয়ী—জীবনানন্দের প্রকৃতদৃষ্টি অসাধারণ, কবি ও ঔপন্যাসিক দু জনই নক্ষত্র লোকের সন্ধানী, ইন্দ্রিয়সচেতনতাও উভয়ের ক্ষেত্রে বিস্ময়মান। কিন্তু জীবনানন্দ বিভূতিভূষণের মতো সহজ নন। জীবনানন্দের কবিতায় অনুভব ছাড়া বুদ্ধিও আছে। বিভূতিভূষণের সবটাই যেন বিশুদ্ধ অনুভব।

॥ ৬ ॥

কবি-সমালোচক মোহিতলাল বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি একজন বড় ঔপন্যাসিক নহেন, শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী মাত্র।"—মোহিতলালের মন্তব্যটি অত্যন্ত মননশীল। এই

একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যকৃতির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'আরণ্যক' থেকেই বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক-বৈচিত্র্য নির্ণয় ও একটি বিশিষ্ট জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন উপন্যাসে চাই। ভালো-মন্দ সমস্ত কিছু নিয়ে জীবনের একটি সমগ্র রূপকে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রখর জিজ্ঞাসার আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবেন। ঔপন্যাসিক জীবনের রূপকারই নন, ভাষ্যকারও। কিন্তু এই জীবন আত্মসর্বস্ব, ভাবময় ও আত্মভাবমুগ্ধ পিপাসাই নয়—এ এক বিস্তৃত বস্তুনিষ্ঠ জীবন-রস—যাতে বহু সুর, বহু কণ্ঠ, বহু পদধ্বনি। আধুনিক সমালোচক তাই উপন্যাসকে প্রাচীন মহাকাব্যের বংশধর ব'লেছেন।

বিভূতিভূষণের মানসজীবনের সঙ্গে খাঁটি ঔপন্যাসিকের জীবনতন্ত্রের একটি পার্থক্যও আছে। বিভূতিভূষণ আত্মময় ভাবনার সাধক, তাঁর হাতে কবি-বাউলের একতারা—তাঁর মন্ত্র আত্মরসের, বিষয়বস্তু তিনি স্বয়ং। তাই তিনি এই বিশেষ রসের সাধনায়ই সিদ্ধ। সেখানে বাইরের বস্তু হৃদয়ের রসে বিগলিত হ'য়ে হৃদয়েরই একটি অংশে পরিণত হয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের 'লিরিক' আস্বাদনটি শুধু তাঁর কবিধর্মেরই স্বরূপ নয়, তিনি যে জীবনকে অবলম্বন ক'রেছেন তাও বিশুদ্ধ 'লিরিক'—লিরিকের মতোই আত্মময়, একতানমণ্ডিত সুরৈকোর সাধক তিনি। কিন্তু ঐ সাধনার আন্তরিকতা ও বিভোরতা যতই থাকুক না কেন, প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের জীবন-বৈচিত্র্য তাতে নেই। মোহিতলালের ভাষায় ঔপন্যাসিকের সাধনা "কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব ঘটিত এক অপূর্ব রহস্যরসের কথা।"—বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই রসোত্থিত জীবনের কোন ছবি নেই। ঔপন্যাসিকের সুর-বৈচিত্র্যের অভাব এখানে আছে। 'আরণ্যকে'র বিভূতিভূষণ যে রসের সাধনা করেছেন, তা বিশুদ্ধ, খানিকটা অতিমর্ত্য। জীবনে যে উর্ধ্বায়ন আছে; তারই জটিলতাহীন চূড়ান্ত বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি সংহত—সেখানে জীবনের দ্বন্দ্ব নেই, বিক্ষোভ নেই, মোহের আধিক্য নেই, আবার মোহভঙ্গ জনিত অবসাদ নেই,—একটি বিশেষ ভাব বা আইডিয়া সেখানে বড় হয়ে উঠেছে, যা প্রধানতঃ লিরিক কবির প্রতিভার অনুকূল। তাঁর একতন্ত্রী আইডিয়া জীবনরহস্যের নূতন নূতন রংমহলের দ্বারোদ্ঘাটন করে নি।

আসল কথা, খাঁটি ঔপন্যাসিকধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবন বিচার করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। উপন্যাস-রচয়িতা এবং খাঁটি ঔপন্যাসিকও ঠিক এক কথা নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্য-সাধনার মূল্য তার জন্য বিন্দুমাত্র কম নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একালে তাঁর মতো অপরূপ গদ্যরীতি ও ভাষাশিল্পে অধিকার কার? 'আরণ্যকে' বিভূতিভূষণের গদ্য স্টাইলের একটি পরিণত রূপ চোখে পড়ে। শব্দ-সম্পদ ও সহজ অলঙ্করণ বাদ দিলেও এই ভাষার একটি সাবলীলতা ও নিজস্ব গতিছন্দ আছে—এ ভাষা ভাবুকতার, ভালো লাগার। ভাষার ধাঁধুনি ও গতিছন্দ শিল্পীর বিশেষ মানসিকতার স্বরূপ হ'য়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তৎসম শব্দ ও সমাস-বিন্যাস, কোনটিই এই ভাষার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করতে পারে নি। বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমাগত যেন ভাষা ও স্টাইলের কর্ষণা কমে আসছে—

কিন্তু গল্পবলার ভঙ্গি ও ভাষাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণের চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেই আছেন, কিন্তু তাঁর মতো শিল্পী তাঁদের কেউই সম্ভবতঃ নন।

'আরণ্যকে'র ভূমিকায় লেখক ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা বলেছেন। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ডায়েরীর আস্বাদনবাহী। ডায়েরীর স্থির-চিত্রগুলি যেন উপন্যাসের রীতিতে বিন্যস্ত। বিভূতিভূষণ ডায়েরী রচনায় কৃতকর্মা—ডায়েরী রচয়িতা বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ডায়েরীর আত্মগত ভাবনা, খণ্ড-চিত্র তাঁর উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ। বিভূতিভূষণ জাত-ঔপন্যাসিক নন, তথাপি উপন্যাস লিখেছেন। এতে বিভূতিভূষণের অগৌরবের কিছু নেই, বরং তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই সূচিত হ'য়েছে। তিনি যেপথের পথিক সেপথ জনহীন, শুধু একজন পূর্বসূরীর উজ্জ্বল পদচিহ্ন সেই পথে—সে পূর্বসূরী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই কারণেই বাংলাসাহিত্যে 'আরণ্যক'-স্রষ্টা অতুলনীয়।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবর্তী)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত আর আগত দিনের আশা-নিরাশার নানান স্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত গভীর ঘুমের মাঝে মানুষ। সারা পাড়া নিশ্চুপ, ঠাণ্ডা গ্যাসবাতিগুলো স্থির হয়ে আলো ছড়াচ্ছে। পাড়ার কুকুরগুলোও অনেক ঘুরে, অনেক চিৎকার করে ঝিমিয়ে পড়েছে, শুধু মোড় থেকে মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি যাওয়ার এক একটা শব্দ আসে রাত দ্বিপ্রহরে। মুখুজ্জে বাড়ীতে জমাট অন্ধকার। সবাই ঘুমুচ্ছে। সারা দিনের নানান কথা, নানান ঘটনা হারিয়ে গেছে, শুধু জমাট অন্ধকারের বুক থেকে স্পন্দন শোনা যাচ্ছে।

সত্যজিৎ স্বপ্ন দেখতে দেখতে চিৎকার করে—কি তীব্র বুক কাঁপানো চিৎকার! ভুবনমোহিনীর ঘুম ভঙ্গলো।

—কে—কি হলো?

ঘুমন্ত শান্তিও চমকে উঠলো।

—শান্তি, ও শান্তি, ওঠ তো একবার, কি হলো আবার সত্যেটার।

—এই সতু, কি হয়েছে রে—বেশ জোরে গায়ে ঠেলা দিয়ে সত্যজিৎকে জাগালো শান্তি।

—কে?

—আমি রে; ওঠ দেখি, একটু জল খা, দাঁড়া আলোটা জ্বালি—শান্তি উঠে আলোটা জ্বাললো।

আলোটা জ্বালতেই শান্তি দেখলো, সত্যজিৎ ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

—কি হয়েছিলো রে! বোবায় ধরেছিল নাকি? নে আগে জলটুকু খা দেখি—এই বলে মাথার শিয়র থেকে জলের গেলাসটা হাতে নিলো শান্তি।

সত্যজিৎ আস্তে আস্তে উঠে বসলো। এখনও ঘোরটা কাটেনি। কোনমতে হাতটা বাড়ালো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

—নে খেয়ে নে—গেলাসটা হাতে দিল শান্তি।

জলটা খেয়ে যেন একটু সুস্থ হলো সত্যজিৎ—কি ভীষণ স্বপ্ন—মানুষ এতো নিষ্ঠুর হতে পারে মানুষের ওপর!

—কি হয়েছিল, স্বপ্ন দেখছিলিস নাকি?

সত্যজিৎ ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

—নে শুয়ে পড়, যা তা ভাববে হতচ্ছাড়া, ঐ করেই শেষ হবে হতভাগা—ভুবনমোহিনী বলে উঠলেন।

সত্যজিৎ কিছু বললে না, চুপ করে শুয়ে পড়লো।

—আলোটা নিবিয়ে দিই ঠাকুমা?

—দে?

—ও মা ঐ দেখ নাতনীর রকমটা দেখ একবার, মেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে।

চন্দ্রাবলী হাসছে স্বপ্নের ঘোরে। কি স্বপ্ন দেখছে? হয়ত আগামী দিনের একটি মিঠে রাতের স্বপ্ন, হাসিতে তারই আভাস।

—এ বাড়ীর ছেলেমেয়ের সকলই বিচ্ছিরি বাপু। নে বন্ধ কর আলোটা—ভুবনমোহিনী বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলেন। ভুবনমোহিনীর পাশে ঘুমন্ত চন্দ্রাবলী হাসছে, ভারি সুন্দর কিন্তু হাসিটি—শান্তির ঘুম-চোখেও ভালো লাগলো দেখতে, দেখলো আরো কিছুক্ষণ, তারপর আলোটা নিবিয়ে আস্তে আস্তে সত্যজিতের পাশে এসে শুয়ে পড়লো।

—ঘুমুলি নাকি সতু?

—না। আস্তে করে বললে সত্যজিৎ।

—আচ্ছা তোরা বেশ স্বপ্ন দেখিস তো, কেউ ভয়ে চিৎকার করিস, কেউ আবার হাসিস্, কিন্তু আমি তো বাপু ও সব স্বপ্ন-টপ্নো দেখি না, কেন বলতো?

এবারও কিছু বললে না সত্যজিৎ।

—কি রে বল, বোবা হয়ে গেলি না কি স্বপ্ন দেখে?

—ঘুমতে দে শান্তি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—তবে ঘুমো আর ঘুমিয়ে আবার জুড়ুবড়ি দেখে আঁৎকে ওঠ; দিন দিন ছেলেমানুষই হচ্ছিস বড় না হয়ে, সবই বিট্‌কেল তোর। সত্যজিৎকে রাগাতে চাইলো শান্তি, ঘুম আসছে না ওর।

সত্যজিৎ কিন্তু রাগলো না। কিছু বললো না, চুপ করে স্বপ্নে দেখা ঘটনাটাকে মনে করতে চাচ্ছিলো—আবছা আবছা মনে হচ্ছে—

হাজার হাজার লোকের চিৎকার—মারলে মারলে, সেও ছুটছে তাদের সঙ্গে প্রাণপণে, তারপর কে যেন পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দিলে, পড়ে গেল সত্যজিৎ। আবার উঠে ছুটতে যেতেই সামনে বীভৎস চেহারার এক জীবকে দেখে চিৎকার করে উঠলো সত্যজিৎ ভয়ে।—তারপর তো শান্তি ডাকলো তাকে। হঠাৎ এরকম স্বপ্নই বা দেখলো কেন সে—ভেবে পেলো না সত্যজিৎ! না, বড্ড ভয় পেয়েছিলো সে, এত ভীতু সে; কেমন যেন লজ্জা পেলো সত্যজিৎ শান্তির কাছে। ঠিক এই সময়ই শান্তি সত্যজিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, রাগ হয়েছিল বুঝি।

—না রে, আচ্ছা ভয় পাওয়াটা খুবই খারাপ না রে?

—হ্যাঁ, যারা দুর্বল তারাই ভয় পায়। খুব ভয় পেয়েছিলি বুঝি তুই?

—হ্যাঁ রে বড্ড, আচ্ছা আমি কি খুব ভীতু ?

—তা একটু ভীতু বৈ কি তুই, মনটা শক্ত করতে পারিস নে কেন ? এত বলি তোকে, বাজে ভাবনা ছাড়, ওতে মনটা ভীতু হয়, যা করবি তাই শুধু ভাববি, এলোমেলো তুই এত যে আমাকেও ভাবিয়ে তুললি।

—আমার জন্য তুই খুব ভাবিস না রে ?

—তা একটু ভাবতে হয় বৈকি ; সোজা দুষ্টুদের তো বোঝা যায় কিন্তু তুমি এলোমেলো দুষ্টু কিনা—শান্তির স্বরটা নরম হয়ে থেমে যায়।

—নারে ও তোর আদরের কথা, আজকাল আমি কত ভাল হয়ে গেছি, একটুও দুষ্টুমি করি না, এখন লজ্জা করে দুষ্টুমি করতে। জানিস দুদিন বাদে দাড়ি কামাবো। পচার দোকানে আড্ডা দেবো।

—তা কামাবে না বিটলের মত, ভাল করে দাড়ি উঠতে না উঠতেই ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামানো হচ্ছে। যা পাজী হচ্ছে বিটলে দিন দিন।

—জানিস কলেজে পড়ছি আজকাল আমরা।

—ও যেখানেই পড়, অসময়ে পাকলে এঁচোড়ে পাকাই হবে, ওসব বিটলের বিটলেমি শিখলে মজা দেখাবোখন তোমাকে। এই বলে শান্তি হাই তুলে মুখে তুড়ি দিয়ে বললে—নে ঘুমো দেখি, আর কথা নয়, ঠাকুমা আবার রাগ করবে। এই বলে শান্তি পাশ ফিরে শুলো !

সত্যজিৎও আর কথা বললে না, চুপচাপ ঘুমতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘুম আসে না, আবার ভাবনা আসছে - শান্তিদি কেন তার জন্য এত ভাবে ? ভালবাসে বলে, শান্তিদি এত ভালো কেন ? আচ্ছা ওর কি কোন দুঃখ আসে না, সব সময়ই ও হাসি ঠাট্টায় মনটা কি করে রাখে। ওর কি রাগ নেই ?

—এই ঘুমলি নাকি শান্তিদি ?

—উহুঁ।

—তোর রাগ হয় না ?

—হয় না আবার, বিশেষ করে তোর ওপর তো হয়নি।

—বাজে কথা বলছিস কেন ?

—বাজে কথা, দেখবি তা হলে !

—না থাক আর ইয়ারকিতে কাজ নেই।

—তবে ঘুমোও ভাবুক ঠাকুর, আর কথাটি নয়। সকলে ডাকতে পারবো না আমি তোমায় ঘন্টাখানেক ধরে।

—আচ্ছা এবার ঘুমতে চেষ্টা করছি।

ঘুম একবার গেছে, টুপ করে কি আসতে চায়। তবু ঘুমতে চেষ্টা করলো সত্যজিৎ পাশ ফিরে শুয়ে। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। আজ কিছুই পড়াশুনা হয়নি।

আবার সেই ভীড় কলেজের গেটের সামনে—ছেলেরা জড় হচ্ছে গেটের সামনে। কি ব্যাপার, স্ট্রাইক না কি ?—সত্যজিৎ গেটের একটু দূরেই থমকে দাঁড়াল। সারি দিয়ে কলেজের পাণ্ডারা দাঁড়িয়ে গেছে—ঐ যে চরণদাসও রয়েছে, দিব্বি মাতব্বরী করছে চরণদাস। কিসের স্ট্রাইক !

—রাজবন্দীদের—কে একজন উঁচু গলায় চিৎকার করে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো—মুক্তি চাই।

বলিষ্ঠ আওয়াজ, বুকের ভিতরটা কি রকম যেন নাড়া দেয়। সত্যজিৎ বইখাতাগুলোকে ভাল করে চেপে ধরলো, আশেপাশে চেনা ছেলেকে খুঁজলো সত্যজিৎ ব্যাপারটা ভালো করে জানবার জন্যে। ঐ তো দীশারী রায় না ? পাশের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে হাসতে হাসতে। সত্যজিৎ এগিয়ে গেল ওদের সামনে।

—এই যে সত্যজিৎবাবু এদিকে। দিশারী রায় তাহলে দেখতে পেয়েছে, অপ্রস্তুত হতে হলো না—একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দিশারী রায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো।

—এই আসছেন বুঝি ? দিশারী জিজ্ঞেস করলো।

মৃদু হেসে সত্যজিৎ বললে—হ্যাঁ, কিন্তু এদিকে কি ব্যাপার ?

—রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলন সুরু হলো ছাত্রদের তরফ থেকে। হেসে বললে দিশারী রায়।

—কতদিন চলবে ?

—কতদিন চলবে তা ঠিক ছাত্র নেতারা বলতে পারেন, তবে বেশ কিছু দিন চললো এমনি, কলেজ আসবেন আর গেট থেকে ফিরে যাবেন। ক্লাশ কিছুদিন বন্ধ করে নিন।

—আচ্ছা কত জন রাজবন্দী আছেন এখন বলতে পারেন ?

—সংখ্যায় অনেক ; বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলখানায় আর আন্দামানে আছেন বন্দীরা, আজ খবরের কাগজ দেখেননি ?

—না। একটু যেন লজ্জা পেল সত্যজিৎ। দিশারীর পাশের মেয়েটি মাঝে মাঝে সত্যজিৎকে লক্ষ্য করছিলো আর কথাগুলো শুনছিলো।

দিশারী এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, ওঁকে চিনতে পারছিস না ?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে আস্তে করে বললে, হ্যাঁ, আমাদের ক্লাশে পড়েন তো উনি, তোমার পাশে বসেন রোজ।

এবার সত্যজিৎ মেয়েটির দিকে এক পলকে চাইলো। কিন্তু পরক্ষণেই চোখটা নামিয়ে নিলো।

—পরিচয়টা করিয়ে দিই, এ হচ্ছে আমার ছোট বোন ও আপনার সহপাঠিনী উত্তমা রায় আর ইনি আমার ও তোমার সহপাঠী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

সমাজসমস্যা

সংবাদপত্রে জ্যোতিষ

কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গলা দেশের বহুল প্রচারিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রগুলিতে রাশি হিসাবে এক সপ্তাহের জ্যোতিষিক গণনার ফলাফল প্রকাশিত হইতেছে।

অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিক বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্রিকায় আজকাল এইরূপ গণনা প্রকাশিত হয়—এই সব পত্রিকার পাঠক সংখ্যা পরিমিত, কিন্তু যে দৈনিক সংবাদগুলির কথা বলা হইল উহা বাঙ্গলা দেশের ও বাহিরের এক অতি বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা পঠিত হয়, সুতরাং এই সাপ্তাহিক ভাগ্যফল পাঠে পাঠকদের উপকার কি অপকার হয় উহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। জনসাধারণের ভবিষ্যত জানিবার কৌতূহল প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই ইহা পরিতৃপ্ত করা প্রয়োজন—ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। ফলিত জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক ইহা লইয়া তর্কের অবকাশ আছে। ইহার সহিত ঈশ্বর তথা কোন ধর্ম্ম বা আস্তিক্য বোধের কোন সংশ্রব নাই। ফলিত জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সংবাদপত্রে যে অতিস্থূল গণনা প্রকাশিত হয় তাহা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রযোজ্য নহে, কচিৎ নগণ্য মাত্রায় এই জাতীয় গণনার সফলতা দেখা যায়, সৎ জ্যোতিষী মাত্র ইহা বোধহয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যদি তাহাই হয় তবে সপ্তাহে সপ্তাহে স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, কর্ম্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা, সন্তানের পীড়া আশঙ্কা, আঘাত প্রাপ্তি যোগ ইত্যাদি ফলাফল সংবাদপত্র মারফৎ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে অযথা বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন করা কি সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য?

কথিত আছে যে জ্যোতিষিক গণনা সূত্রে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয় আসন্ন জানিয়া মহারাজ লক্ষণ সেন প্রতিরোধ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। জ্যোতিষে অবিশ্বাস করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে পারিলে বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসের এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের ইতিহাস আমাদের এই ভাবে পীড়িত করিত না।

যে দেশের মানুষের ক্ষুধার অন্ন নাই, পরিধেয়ের ও মাথা গুঁজিবার আশ্রয়ের অভাব, নারীর মর্য্যাদা বিপন্ন, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আধি-ব্যাধিতে প্রাণ কণ্ঠাগত সে দেশের সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম মানুষেরা কাজে মন না দিয়া এ সপ্তাহে আমার কি হইবে লইয়া মাথা ঘামাইতেছে—এ এক শোচনীয় দৃশ্য! হরিশ্চন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শিশিরকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির ঐতিহ্য-বাহক বাঙ্গালী সংবাদপত্র পরিচালক ও সম্পাদকদের নিকট জাতি-এই দুর্দিনে পথনির্দেশই আশা করে। জাতির প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহারা বহু ক্ষেত্রে পালন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যুগোপযোগী সংবাদ প্রচার ও মতামত গঠন ছাড়াও কৃষি শিল্প বাণিজ্য

উদ্যোগ পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিত্য নূতন বিশেষ সংখ্যা বা বিশেষ পৃষ্ঠা প্রকাশ দ্বারা তাঁহারা অবশ্যই জাতি গঠনে সহায়তা করিতেছেন, কিন্তু দেশবাসিকে জ্যোতিষ গবেষণা মুগ্ধ করিয়া তোলার ফলে তাঁহাদের সকল লোক-কল্যাণ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে ও হইবে। আজ জনসাধারণকে কর্ম্মযোগে উদ্বুদ্ধ করাই একমাত্র জাতীয় কর্ত্তব্য।

যাঁহারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জ্যোতিষীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করুন, এই বিষয়ে পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করুন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। আপত্তিকর শুধু অতিস্থূল গণনামূলক সপ্তাহের ফলাফল জনসাধারণের নিকট বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র (বিশেষভাবে বাঙ্গলা সংবাদপত্র) মারফৎ পরিবেশন। গণনার যথার্থতা সন্দেহাতীত নহে অথচ এস্থলে ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের চিত্তস্থৈর্য ব্যাহত ও কর্ম্মোদ্যম স্তম্ভিত করিতে সহায়তা করে।

ধরিয়া লওয়া গেল জনসাধারণের ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয্যেই সংবাদপত্রগুলি এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সংবাদপত্রগুলি দেশবাসিকে শ্রেয় বস্তু পরিবেশন করিবেন শ্রেয়বস্তু নহে, কারণ সংবাদপত্রগুলি এক একটি জাতিকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র নহে—সংবাদপত্রগুলিও এই দাবী করিয়া থাকেন। মদ্য, গঞ্জিকা ও অহিফেন সুলভ নহে বলিয়াই ইহার সেবকের সংখ্যা অল্প, সরকার ইহা সুলভ করিলে বহুলোকের মধ্যে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হইতে পারে, সরকারের আয় বৃদ্ধির পথও সুগম হয়। কিন্তু এই সব ক্ষতিকর মাদক দ্রব্যের প্রচার যেমন সরকারের কর্ত্তব্য নহে, সংবাদপত্রেরও তেমনি নহে জনসাধারণের কর্ম্মশক্তির হানিকারক কোন তথ্য পরিবেশন। আমরা স্বভাবতঃ আরামপ্রিয় ও কর্ম্মপরাঙ্মুখ। ইহার উপর সংবাদপত্রে এ সপ্তাহের ফলাফলের পৃষ্ঠায় গুপ্ত শত্রু কর্ত্তৃক কর্ম্মস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সংবাদ জানিতে পারিলে সেই সপ্তাহে যে কিরূপ উৎসাহের সহিত কাজ করিতে পারিব তাহা সহজেই অনুমেয়। বিপদের আশঙ্কা বিপদ ডাকিয়া আনে ইহা সুবিদিত। কর্ম্ম সুসম্পাদনের পক্ষে মানসিক প্রফুল্লতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এ সপ্তাহে "পত্নীর সহিত মনোমালিন্য" সম্ভাবনায় কাতর হতভাগা ব্যক্তির উপর যদি কোন গুরুতর সরকারী কর্ত্তব্য ন্যস্ত থাকে তবে যে তাহার পরিণতি কিরূপ হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। "পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা কম" যে দুর্ভাগা পরীক্ষার্থীর এ সপ্তাহের ঘোষিত ফল সে মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র হইলেও যে ভাল পরীক্ষা দিতে পারিবে না ইহা সুনিশ্চিত। সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষাগুলিতে বাঙ্গালী ছাত্রদের ব্যাপক ব্যর্থতার মূলে নানাকারণের মধ্যে জ্যোতিষে বিশ্বাসও হয়ত বহুল পরিমাণে দায়ী—সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক ফলাফলের ইহারাও উৎসাহী পাঠক।

দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই নূতন বিপদের দিকে কবে আকৃষ্ট হইবে? উদ্ভিন্ন সংবাদপত্র সম্পাদক ও পরিচালক মহাশয়েরা দেশবাসিকে কি গভীর তমোগহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছেন সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবার মত কণ্ঠ কি দেশে নাই?

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

চিত্রকলা

এ্যাকাডেমি অব্ আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টস্

এ্যাকাডেমি অব্ আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টস-এর তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠানটির সচলতার প্রমাণ। পূর্ববর্তী দুটি প্রদর্শনীর তুলনায় এবারকার প্রদর্শনীতে অধিক সংখ্যক চিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এবং তাদের শিল্পকর্মের মানও মোটামুটি উন্নততর। প্রদর্শনী হয়েছে এস্‌প্ল্যানেড ইস্টে শো-রুম সদৃশ একটি বিরাট কক্ষে—একতলায়। স্থান নির্বাচনে আমরা সুখী হতে পারি নি। আলোর ব্যবস্থাও ত্রুটিযুক্ত মনে হয়েছে। চিত্র যত মনোরমই হোক তা যথাযথ ভাবে পরিবেশিত হওয়ার তিনটি প্রধান শর্ত হল এই—সুন্দর স্থান, পরিমিত আলোর ব্যবস্থা, চিত্রসংস্থানের সুবন্দোবস্ত। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অভিযোগের কারণ থাকলেও গোড়ার দুটি প্রশ্নে আমাদের প্রত্যাশা সবিশেষ অপূর্ণ থেকে গেছে। প্রথমতঃ গৃহের Plinth অতিশয় নীচু। তারপর স্থানাভাব হেতু অনেক ছবি একসঙ্গে গাদাগাদি করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চিত্রগুলির ঘনসন্নিবদ্ধ সংস্থান হেতু চোখ বিশ্রাম পাবার আকাশ পায় না। ছবির সৌন্দর্যে দৃষ্টি সুস্নিগ্ধ না হয়ে ছবির ভারে দৃষ্টি পীড়িত হয়। এই পীড়া আরও বাড়িয়েছে আলোর চোখ ধাঁধানো বিভ্রান্তি। বিশৃঙ্খল আলোক সম্পাতের জন্য বারবার চোখ রগড়াবার প্রয়োজন হয়েছে। ভবিষ্যতে এই দিকে আর একটু দৃষ্টি দিলে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা দর্শকসাধারণের ধন্যবাদভাজন হবেন।

প্রদর্শনীতে বহু দর্শনীয় চিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। তার ভিতর নূতন পুরাতন উভয় শ্রেণীর চিত্রই ছিল। পুরাতন চিত্রের মধ্যে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য যামিনী রায় ও নন্দলাল বসু মহাশয়ের কতিপয় চিত্র ছিল। মুকুল দে. মহাশয়ের দুটি এচিং ছিল। উদ্যোক্তারা সদ্য লোকান্তরিত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চিত্রাবলীর জন্য একটি আলাদা কোণ সংরক্ষিত করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুন্দর উপায় এটি। রমেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করে বাংলা দেশের নিসর্গ শোভা ও পল্লীর আবেষ্টনী একটি সংহত আধারে কিছুক্ষণের জন্য দুচোখ ভরে দেখে নেওয়া গেল। রমেন্দ্রনাথের চিত্রে আধুনিক কালোচিত জটিলতা নেই, কিন্তুত রীতির প্রশ্রয় নেই। এতে হয়তো নগরনিবদ্ধ মনের বৈচিত্র্যের ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত থাকে, কিন্তু মন শান্ত রসে ভরে ওঠে। শান্তিনিকেতনের আপেপাশের পল্লী প্রকৃতিকে আচার্য নন্দলালের মত তিনিও কী চমৎকার ভাবে না রূপায়িত করেছেন তাঁর ছবিতে। শান্তকালদের স্বাস্থ্য ও আনন্দভরা মুখ ও তাদের গৃহযাত্রার ছবি দেখতে দেখতে মন কখন সভ্যতার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর আদিম সারল্যে সংস্থিত হয় তার ঠিকঠিকানা থাকে না। রমেন্দ্রনাথের পল্লীচিত্রগুলি বর্তমান কালের পটভূমিতে আমাদের সনাতন অতৃপ্ত ইচ্ছার

এক চিত্রল রূপ। সেই দিক দিয়ে তাঁর ছবির সারল্য মনকে স্পর্শ না করে পারে না। চিত্রসমালোচকেরা তাঁর শিল্পকর্মের গুণাগুণ বিচার করবেন, আমরা প্রকৃতির কোলে বারেকের জন্য চলে পড়তে পারলেই তৃপ্ত।

পুরাতন সংগ্রহের ভিতর বিগত শিল্পীদের শিল্পকর্মের নমুনাও কিছু কিছু ছিল। সবগুলি ছবি সমান উল্লেখযোগ্য এমন বলা চলে না, তবে মূল্যবান নমুনার অসদ্ভাব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ জগদীশচন্দ্র সিংহের সংগ্রহের টিসিয়ানকৃত Hercules and Hebe, মহারাজা প্রদ্যোৎমোহন ঠাকুরের সংগ্রহের জন জোফানীর Chess Players, হেন্‌রী সিঙ্গলটন-এর Discovery of the body of Tippoo Sultan, স্যার ডেভিড উইলকি-র Chelsea pensioners প্রভৃতি ছবি উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীঅরুণ সেনের সংগ্রহ থেকে বিলম্বিত হয়েছে তিনটি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার নমুনা।

নূতন ছবির সমাবেশ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমকালীন ভারতীয় চিত্রকরেরা বিগত যুগের রোমান্টিক চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং অত্যুগ্র মাত্রায় আধুনিক বিস্তৃত চিত্রকলা-পদ্ধতি কোনটিই অবলম্বন না করে দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ সন্ধান করে ফিরছেন। তাঁদের ছবিতে কল্পনার প্রলেপ আছে। তবে তা বাস্তববোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে নির্জন মনের লীলা আঁকবার নামে আধুনিক যুগের সুররিয়ালিষ্টধর্মী স্বেচ্ছাচারের নৈরাজ্যও তাতে নেই। শিল্পীরা ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপর শোভনতার সীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব ইউরোপীয় আঙ্গিকের ভর সঞ্চারার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে ইউরোপীয় কলাকৌশলকে ভারতীয় চিত্রাঙ্কনরীতির অনুগত করে তুলছেন। বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান নাগরিকতার প্রভাব। তা বলে নিসর্গ চিত্রের প্রতি ভারতীয় শিল্পীমনের সহজ পক্ষপাত দূর হয় নি। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর নিসর্গ চিত্র "জমায়েতে"র মধ্যে আমরা একই কালে প্রকৃতিপ্রেম ও নাগরিক জীবনের প্রকর্ষাদি সম্পর্কে সচেতনতার প্রমাণ পাচ্ছি। এটি এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র, এবং বিভিন্ন মহলের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। সত্যসেবক মুখার্জির নিসর্গ চিত্র "একটি নিভৃত জলাশয়"-এর মধ্যেও এই নাগরিকতার প্রভাব লক্ষ্য না করে পারা যায় না। চন্দ্রনাথ দে-র "একটি অপরাহ্ণ" চমৎকার স্থানচিত্র। ছবিটির সৌন্দর্য ও মাধুর্য চোখ ভরে উপভোগ করবার মত।

প্রাচীন রীতি আর আধুনিক অঙ্কনশৈলীর দ্বন্দ্বের ডামাডোলের মধ্যে একটি জিনিস ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তা এই যে, 'প্রাচ্য চিত্রকলা' রূপে খ্যাত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি বিশেষের আর ভবিষ্যৎ নেই। প্রদর্শনীর অন্যান্য বিভাগের পাশে এই বিভাগটিকে সঙ্গত কারণেই নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। অবনীন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্রনাথ-অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত রেখাচিত্রের উপর অন্ধ অনুকরণের ধাপা বুলিয়ে এ কালের পরিবেশে সিদ্ধির আশা দূরপরাহত। উল্লেখিত বিশিষ্ট শিল্পীগণ প্রাচ্য কলারীতির এক একজন শ্রেষ্ঠ প্রকাশক। তা হলেও ওই সামান্য লক্ষণের সীমার মধ্যে তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অবনীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবিত্বের অধিকারী, নন্দলাল শাস্ত্ররসের সাধক, ক্ষিতীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভক্তিবাদে সমর্পিতপ্রাণ, অসিতকুমার প্রাচীন বৌদ্ধ ভারতের জয়গাথায় মুখর,

প্রমোদকুমার বীর্য ও পৌরুষের উদ্‌গাতা। কিন্তু এখন তাঁরা এই রীতির অনুসরণে ছবি আঁকেন তাঁদের ছবির ভিতর বর্ণিত গুণের কোনটিরই সাক্ষাৎ পাই না। অন্ধকার ভারতীয় রীতির ছবিতে খোলসটুকু মাত্র বর্তমান, প্রাণ অন্তর্হিত। আত্মপ্রকাশের প্রয়াস যে-পরিমাণ অনুকরণাত্মক ততটাই যান্ত্রিক। সজীবতার ছাপ কোথাও চোখে পড়ে না। তবু এরই মধ্যে শ্রীমতী গৌরী দত্ত রায়ের "দণ্ডকারণ্য" ছবিটি বর্ণপ্রলেপকুশলতায় ও অঙ্কনের গুণে আমাদের সবিশেষ তৃপ্তির কারণ হয়েছে। এঁর আঁকার হাত সুন্দর। শান্তিরঞ্জন মুখার্জির "শক্তিপেল" যতদূর মনে হয় পূর্বপ্রদর্শিত চিত্র। এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে শ্রীঅবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের "জ্যোৎস্না-অভিসার" চিত্রটি।

আধুনিক বিভাগে আমিনা আমেদের ছবিগুলি উচ্চ শিল্পকুশলতার পরিচায়ক। এই মহিলা-শিল্পীর "নদীতীরবর্তী বৃক্ষ" এ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার তালিকায় এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করেছে। শ্রীগোপেন রায়ের অঙ্কিত ছবিগুলিতে পরিকল্পনার অভিনবত্ব এবং পটভূমির ব্যাপ্তি লক্ষনীয়, কিন্তু ছবিগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করবার মত বোধশক্তি আমাদের নেই সে কথা অপকটে স্বীকার করব। দর্শকের সহজ বুদ্ধি ও অনুভব ক্ষমতাকে বিভ্রান্ত আর বিমূঢ় করাই যদি আধুনিক চিত্রকলার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সেই দিক দিয়ে ছবিগুলি যে খুবই উৎরেছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টিতে এই রাবীন্দ্রিক কুয়াসার অর্থ কী। এ ছবি হেঁয়ালী না প্রহেলিকা? রূপকথার পরিবেশের সঙ্গে এ ছবির শুধু নামগত সম্পর্ক, রূপকথার স্বপ্নাবেশ এ ছবি দেখে জাগে না। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা আর নিকোলাস রোরিকের ছবি একত্র সম্মিলিত করলে যে জবরজঙ্গ জিনিষ দাঁড়ায় গোপেন রায়ের ছবি হল তাই। তিনি এ প্রদর্শনীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা, সুতরাং সাধারণ দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁকে অবহিত হতে অনুরোধ করি। এস্‌, এস্‌ বেনীগাঁয়ের "নাপিত" চিত্রটি আধুনিক চিত্ররীতির একটি নিপুণ নিদর্শন। এর অঙ্কনের মধ্যে অভিনবত্ব আছে, কিন্তু বিষয়বস্তু পরিষ্কার।

তৈলচিত্র বিভাগে প্রখ্যাত চিত্রকর সতীশ সিংহ মহাশয়ের আঁকা শিল্পকর্মগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর "পুরীর সমুদ্রতীর", "দর্পণ", "বাঙালা মহিলা" প্রভৃতি চিত্র বর্ণপ্রলেপে নিখুঁত, সুষম, বাস্তবানুগ। কিন্তু তাঁর "স্নানপূর্ব" ছবিটির রুচি কোনমতেই অনুমোদন করতে পারলুম না। ছবিটিতে অঙ্কনদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ছবির ভঙ্গীই শালীনতাবোধের পরিপন্থী। বাস্তবসঙ্গতির নামে যে কোন ছবিই যদি পরিবেশনের যোগ্য হয় তাহলে অন্দর আর সদরের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। সুরুচির মুখ চেয়ে কোথাও না কোথাও সীমারেখা টানতেই হয়।

ভাস্কর্য বিভাগে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করেছে গোপাল কারারের "মা ও শিশু-সন্তান"। শিল্পকর্মটির ভিতর মায়ের স্নেহকাতরতায় ভাবটি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে মায়ের ব্যক্তিত্ব। গঠিত মাতৃমূর্তির পদযুগল ও জানুর অনুপাত-অতিরিক্ত পৃথুলতা মায়ের এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। দেহের ভার-বহুলতা আধুনিক ভাস্কর্যের একটি রীতি।

নারায়ণ চৌধুরী

গ্রন্থপরিচয়

মরুতীর্থ হিংলাজ : অবধূত। মিত্র ও ঘোষ। পাঁচ টাকা।

উপন্যাস ঠিক বাঙালী লেখকের ধাতে পোষায় না। উপন্যাসে যে বিস্তৃতি, যে ব্যাপকতা এবং চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন প্রয়োজন, অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসে তার অভাব দেখা যায়। সত্যি বলতে কি, আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কটি সার্থক উপন্যাস রচিত হয়েছে—আঙুলে গুণে বলে দেয়া যায়।

অথচ উপন্যেসতর রচনায় বাঙালী লেখকের হাত খোলে ভাল। সে ছোটগল্পই হক, আর ভ্রমণকাহিনীই হক, কিম্বা রম্যরচনাই হক। রম্যরচনার পরিধিকে যদি একটু বিস্তৃত করা যায় তাহলে দেখা যাবে গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী লেখকের মেজাজ হচ্ছে গীতিকবিতার মেজাজ। তাই তার পক্ষে মহাকাব্য বা উপন্যাস রচনা একেবারে অসম্ভব না হলেও দুরূহ। ছোটগল্প কি রম্যরচনায় সে যেমন স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, এমন আর কিছুতে নয়।

বাংলা সাহিত্যে বহু সার্থক ভ্রমণকাহিনীও রচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে রম্য রচনা লিখে সম্প্রতি অনেক লেখক প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। এঁদের রচনায়-যে অপরিণতির চিহ্ন আছে তা নয়, পরন্তু সূক্ষ্ম রসিকতা এবং ভাষাপ্রয়োগে পারদর্শিতা সকলকে অবাক করে। কিন্তু উপন্যাস রচনায় যে শ্রেষ্ঠীর পরিণতির একান্ত প্রয়োজন তা এঁদের অনায়ত্ত; শেষোক্ত গুণগুলি সেক্ষেত্রে বাড়তি গুণ—না হলেও চলে।

ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। সেখানে যদি লেখা সরস না হয়, ভাষার অনায়াস-গতি না থাকে, বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষতার অসদ্ভাব ঘটে, কবিত্বের মিশেল যদি না দেওয়া হয় তবে ভ্রমণকাহিনী সার্থক রসসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। শ্রীঅবধূত লিখিত "মরুতীর্থ হিংলাজে"র মধ্যে উপরিউক্ত সবকটি গুণই উপস্থিত। কেদার-বদরিকাশ্রম অথবা কুম্ভমেলা ভ্রমণের কাহিনী ইতিপূর্বে আমরা পড়েছি, কিন্তু দুর্গম মরুপথ পার হয়ে যে-হিংলাজ-মায়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে, সে তীর্থপরিক্রমার কাহিনী শ্রীঅবধূতই এই প্রথম লিখলেন। লেখকের "পুরা নাম কালিকানন্দ অবধূত। সত্যকারের সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক সাধক।" নানা মাসিকপত্রে এঁর লেখা কিছু কিছু পড়েছি। সেগুলি ছিল হাস্যরসাত্মক কাহিনী—হিউমার ও স্যাটায়ারের সমন্বয়। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল—অত্যন্ত পাকা লেখা। ভাষার ওপর বেশ দখল আছে; অবশ্য ভাষায় মোচড় দেওয়ার অত্যধিক প্রয়াস এবং শব্দ ব্যবহারের কিছু ত্রুটি চোখে পড়েছিল। তবে যে জিনিষটি সবচেয়ে ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে, পরিহাসের পাত্রদের সঙ্গে লেখক নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন—দূর থেকে বিদ্রূপ-বাণ ছাড়েননি—নিজেকেও তাদের মধ্যে একজন গণ্য করেছেন। তাতে বুঝেছিলাম,

লেখক হৃদয়হীন ফ্যাটায়ারিষ্ট নন—মানুষের দৌর্বল্যকে শুধুমাত্র ব্যঙ্গ করতে পরাঙ্মুখ। আসলে মানুষকে ইনি ভালবাসেন এবং "ভালবাসেন সমস্ত দোষগুণ সুদ্ধ"। এইখানেই এই শ্রেণীর অন্যান্য অনেক লেখকের সঙ্গে শ্রীঅবধূতের পার্থক্য।

আর তাই "মরুতীর্থ হিংলাজ"ও পাঠকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সমাজে, সংসারে মানুষের এক রূপ—আবার মানুষ যখন সমাজ সংসার পেছনে ফেলে মহাতীর্থ দর্শনের দুর্গম পথে পাড়ি দেয় তখন আর এক রূপ। শ্রীঅবধূতের চোখে আমরা মানুষের এই রূপ দেখে স্তম্ভিত হই। একদা করাচীর হাব নদী পার হয়ে যে যাত্রা সুরু হয়েছিল, অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং দৈহিক নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে তা সমাপ্ত হল বটে, হিংলাজ-দর্শনও ঘটল—কিন্তু আনন্দ কোথায়? ইতিপূর্বে ট্রাজিডীর যে-বীজ রোপিত হয়েছিল, তা মহীরুহে পরিণত হল—দুটি ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবকযুবতী ধিরুমল ও কুন্তীর শোচনীয় পরিণতি তীর্থযাত্রী মানুষগুলির মর্মমূলে আঘাত দিল। হিংলাজ-দেবী দর্শন করে ফেরার পথে লেখক, ভৈরবী ও কুন্তী দলছাড়া হয়ে পড়েন। গন্তব্যস্থল অঘোর বাবার আশ্রম খুঁজে পান না। এদিকে জল-পিপাসা বাড়তে থাকে। খানিক আগে যে নদী তাঁরা পার হয়েছিলেন, সে নদী হারিয়ে গেছে। এখন শুধু বালি, বালি, আর বালি। শেষ পর্যন্ত পথপ্রদর্শক গুলমহম্মদের উট গন্ধ শুঁকে তাঁদের খুঁজে বার করেছিল। সে অনেক পরে। ততক্ষণে হতভাগিনী কুন্তী পিপাসায় কাতর হয়ে সেই মরুভূমির মধ্যে কোথায় চলে গেছে: অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে আর পাওয়া গেল না।

আর এক হতভাগ্য ধিরুমল। অকালে তার জীবনে যবনিকা পড়েছে। কিন্তু বড় বৈচিত্র্যময় জীবন। ছোট বেলায় তার বাপ মা দুজনেই হয় মারা যায় নয় তাকে ফেলে পালিয়ে যায়, সে বড় হয় অদ্ভুতভাবে। তবু তার শেষ পরিণতি যে হবে অমন ভয়াবহ তা কে জানে। বই শেষ করেও ধিরুমল আর কুন্তীর জন্যে মনটা হাহাকার করতে থাকে। আর একজনের জন্যে দুঃখ জাগে। তিনি শ্রীজয়শঙ্কর পাণ্ডে—তীর্থ করতে এসে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাছাড়া, প্রত্যেকটি চরিত্রই উজ্জ্বল—উট দুটিও চরিত্র হয়ে উঠেছে। পোপটলাল, রূপলাল, সুখলাল, ভৈরবীকে একান্ত কাছের মানুষ বলে মনে হয়; বৃদ্ধ গুলমহম্মদ আমাদের মন কেড়ে নেয়।

পরিশেষে শ্রীঅবধূতের ভাষা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। আগাগোড়া ভাষা প্রায় বিষয়োপযোগী এবং যথেষ্ট গাম্ভীর্যও রয়েছে। মাঝে মাঝে হাস্য-পরিহাসের ছটা একটানা বর্ণনাকে সহনীয় করেছে। কিন্তু এক-এক জায়গায় দু-একটি বিদ্‌কুটে শব্দ ব্যবহারে হোঁচট খেতে হয়। এটুকু শ্রীঅবধূতের রচনার ত্রুটি।

হীরেন বসু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ১৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৭, ন্যায়রত্ন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।